সিদ্ধার্থ ঘোষ

সূর্য থেকে শক্তি





২৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রোদ্দুর চোরের দেশে দুর্ধর্ষ অভিযান

সূর্য থেকে শক্তি

সিদ্ধার্থ ঘোষ

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

SURYA THEKE SAKTI
(Energy from the Sun)

by Sidhartha Ghosh
An adventure in the country of
SUNSHINE STEALERS
in A. D. 2899

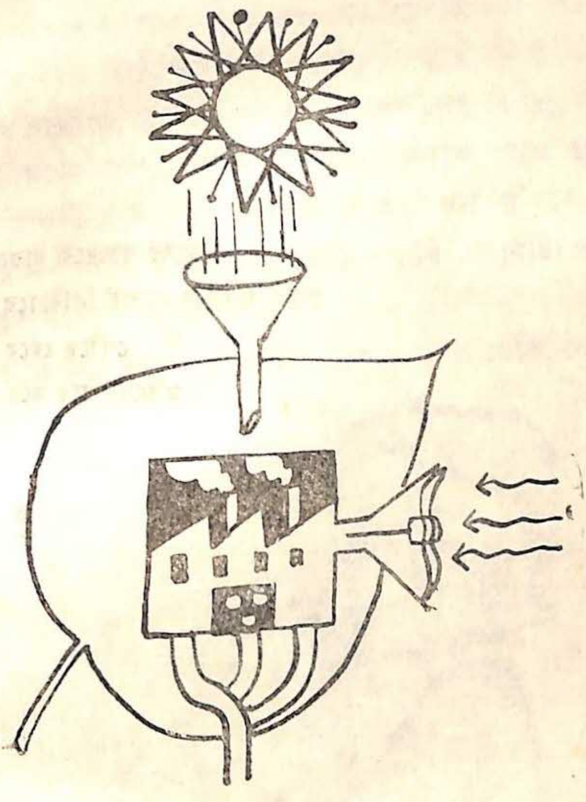
প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রক :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

দাম : বারো টাকা

সূর্য থেকে শক্তি



সূর্যের সম্পদকে যারা
সূর্যের আলোর মতোই নির্বিচারে
পৌঁছে দেবে
মানুষের ঘরে ঘরে

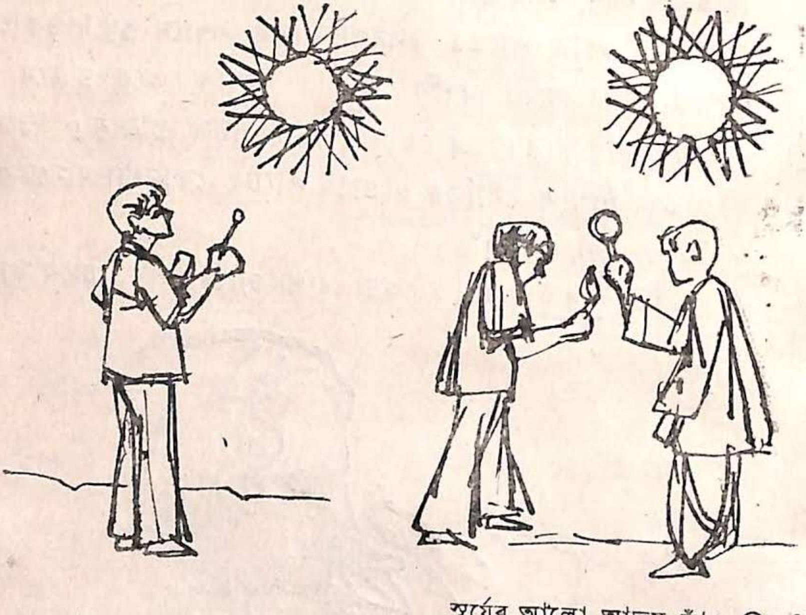
হঠাৎ চোখ দুটো যেন ঝলসে গেল সৌতির। সুদেষ্ণা তো 'আরে ব্বাস্' বলে চোখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কি রকম ব্যাপার হল? সব বাড়ি ঘরগুলো এমন চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে কেন? চোখ কুঁচকে ভয়ে ভয়ে তাকাল দু'জনে। রাঙতার পাত দিয়ে কে যেন বাড়িগুলোকে একেবারে মুড়ে দিয়েছে। আবার যেখানে রাঙতার পাতের ঝলমলানি নেই সেখানে শুধু দাঁড়কাকের গায়ের মতো ভুসো কালি লেপা। অবাক হয়ে দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এ কোথায় এসে পড়ল দু'জনে! সুদেষ্ণা হঠাৎ টান লাগাল সৌতির হাওয়াই শার্টের কোনাটা খামচে ধ'রে —"ছাখ্ দাদা, ছাখ্!"

সৌতি ঘুরে দাঁড়াল। একটা রোগা ঢ্যাঙা লোক, চোখে কালো



চশমা, ফুটপাথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ডান হাতে একটা আতস কাঁচ বাগিয়ে ধরে ঠোঁটে গোঁজা সিগারেটটা ধরাতে চাইছে।

সৌতির মনে পড়ে গেল ইস্কুলে মাস্টারমশাই একবার সূর্যের আলোয় আতস কাঁচ ধরে কাগজে আগুন ধরিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। সুদেষ্ণাকে বোকা বোকা মুখে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, "দূর, এত অবাক হবার কি আছে। অনেকখানি সূর্যের তাপকে এই আতস কাঁচটা দিয়ে খুব ছোট্ট একটা জায়গায় জড়ো করে ফেলছে কিনা তাই আগুন ধরে যাচ্ছে। বুঝলি না?"



সূর্যের আলোয় দেশলাই ধরলে সেটা জ্বলে ওঠে না।

সূর্যের আলো আতস কাঁচ দিয়ে দেশলাই কাঠির মাথায় জড়ো করলে দেশলাই জ্বলে ওঠে।

সুদেষ্ণা বুঝল কি বুঝল না জানা গেল না কিন্তু ওকে ছুট লাগাতে দেখা গেল। সোজা ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে হাজির, "আপনার দেশলাই ফুরিয়ে গেছে বুঝি?"

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে সুদেষ্ণার দিকে তাকিয়েই ভুরু কুঁচকে বললেন, "একী! তোমার কালো চশমা কোথায়? এক্ষুনি যে পুলিশ—"

সুদেষ্ণা কোন কথাই শুনতে চায় না। "বলো না—তোমার দেশলাই ফুরিয়ে গেছে বুঝি?"

এবার ভদ্রলোকের অবাক হবার পালা।

"দেশলাই? সেটা কি জিনিস? ওহো—বুঝেছি বুঝেছি। কয়লা-তেলের যুগে এরকম একটা ক্ষুদ্র বহনযোগ্য জ্বালানী খুব তৈরি হতো বটে। কিন্তু সেসব জিনিস তো কবে উঠে গেছে। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার আমলের পর বোধহয় আর তৈরি হয়নি।"

সৌতি আর সুদেষ্ণা একসঙ্গে বলে উঠল, "তার মানে?"

"আমিও তো সেই একই প্রশ্ন করছি। দেশলাইয়ের নাম তোমরা জানলে কি করে—তোমাদের মতো পুঁচকেদের তো জানার কথা নয়। তাছাড়া কালো-চশমা না পরে বেরিয়েছো যে বড়?"

সৌতি বলল, "আমাদের তো কালো চশমাই নেই।"



৮৯৯ সূর্যাব্দে দিনের বেলা পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের চোখে কালো চশমা

ভদ্রলোক বললেন, "তার মানে? ২০০০ সালের পর থেকে পৃথিবীতে এমন একটি লোক দেখা যায় না যার কালো চশমা নেই। চোখ তো রিফ্লেক্টারের ঝলসানিতে অন্ধ হয়ে যাবে!"

সৌতি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন কত সাল?"

"কেন! সূর্যাব্দ আটশো নিরানব্বই বা পুরনো হিসেবে ২৮৯৯ খৃষ্টাব্দ।"

সূর্যাব্দ! ২৮৯৯ খৃষ্টাব্দ! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ভাইবোন। "কিন্তু এই একটু আগেই তো আমরা বিংশ শতাব্দীতে ছিলাম। লোড্‌শেডিং হয়েছিল বলে দারুণ গরমে হাঁসফাঁস করছিলাম। কিছুতেই পড়ায় মন বসছিল না।"

ভদ্রলোক এবার মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে বলেন, "তা হলে তোমরা নিশ্চয় পুরনো পৃথিবীর লোক, হঠাৎ ভবিষ্যতের পৃথিবীতে এসে পড়েছ। সেই জন্যেই সব কিছুই তোমাদের নতুন লাগছে। বুঝেছি—বুঝেছি—"

সুদেষ্ণা বড় পাকা। কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠল, "কি মজা! ভবিষ্যতের পৃথিবীটা কেমন চেনা হয়ে যাবে। আপনি আমাদের সব বুঝিয়ে দেবেন তো? সব যে ম্যাজিকের মতো লাগছে।"

ভদ্রলোক এতক্ষণে হাসলেন। সৌতিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক্, রাগ করেননি উনি।

"তোমরা আমাদের দেশে অতিথি বলে কথা, না-দেখিয়ে উপায় আছে।"

"আপনার নাম কি দাদা?" সুদেষ্ণা আবার প্রশ্ন করল।

"আমার নাম কিরণ। তোমরা কিরণদা বলেই ডেকো।"

সুদেষ্ণা আবার কি বলতে যাচ্ছিল, সৌতি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আপনি কিন্তু এখনো বললেন না, দেশলাই নেই কেন? তাছাড়া সূর্যাব্দ মানেই বা কি?"

"বলছি, বলছি। শুধু দেশলাই কেন, এখন আমাদের কোন জ্বালানীই আর নেই বললেই চলে। মাটির তলাকার কয়লা আর তেলের ভাঁড়ার তো পুরো খতম। প্রাকৃতিক গ্যাসও নেই। কাঠের ব্যবহার আমরা খুব কমই করি—বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। এখন সবচেয়ে

বেশী ব্যবহার হয় সূর্যশক্তি। সূর্যের আলো আর তাপ দিয়েই বেশীর ভাগ কাজ সারা হয়। তবে পারমাণবিক শক্তিও রীতিমতো ব্যবহার হচ্ছে।”

সৌতি বলে উঠল, “সূর্যের আলো আর তাপ দিয়েই সব কাজ চলে যায়? আশ্চর্য তো! তবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার তো আমাদের পৃথিবীতেও হচ্ছে।”

“হ্যাঁ—পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার তোমাদের পুরনো পৃথিবীতেই শুরু হয়েছিল। সূর্যশক্তির ব্যবহারও অল্পসল্প হচ্ছে তোমাদের পৃথিবীতে। কিন্তু দু' হাজার খৃষ্টাব্দ থেকে আমরা সূর্যকাল গণনা করছি। যেমন যিশুখৃষ্ট জন্মাবার পর থেকে খৃষ্টাব্দ গোনা হত আগে। এখন আর আমরা খৃষ্টাব্দ বা খৃষ্টপূর্ব বলি না। বলি সূর্যাব্দ কিম্বা সূর্যপূর্ব অত বছর।”

সৌতি দেখল সুদেষ্ণা তার কাছে ঘেঁষে এসে হাতটা টিপে ধরেছে। অমন যে ডানপিটে মেয়ে—দাদাকে প্রায় গ্রাহ্যই করেনা, ব্যাপারস্যাপার দেখে বেশ ঘাবড়ে গেছে।

“আপনাদের এখানে তাহলে সূর্যশক্তি আর পারমাণবিক শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি ব্যবহার হয় না?”

“না, তা ঠিক নয়। বাতাসের শক্তি দিয়ে বাতাসের কল বা উইণ্ড মিল্ চলে। জলের শক্তি থেকে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের ঢেউ থেকে বা পৃথিবীর পেটের ভেতর জমা গরম জল আর বাষ্প থেকেও বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। কিন্তু তোমরা তো জানো, পুরনো পৃথিবীতে কয়লা তেল আর গ্যাস পুড়িয়েই সব চেয়ে বেশী শক্তি উৎপাদন করা হত। এখন কিন্তু এই তিনটে জ্বালানী প্রায় ফুরিয়ে গেছে আর তাই সূর্যের আলো আর তাপ দিয়েই এই অভাব মিটিয়ে নিতে হচ্ছে। যেটুকু কয়লা বা তেল আছে সেটা নানা রকম ধাতব দ্রব্য ও অন্যান্য কিছু কিছু জিনিস তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়।”

"আপনাদের তাহলে এখন ভারী অসুবিধে বলুন?" সৌতি বিজ্ঞের মতো প্রশ্ন করল।

"অসুবিধে কিসের? বরং কত সুবিধে। সূর্যের আলো কিনতে তো পয়সাই লাগেনা। শুধু কায়দাটা জানা থাকলেই হল। এই ছাখোনা, দেশলাই ব্যবহার না করে আমি আতস কাঁচ দিয়ে কেমন সিগারেট ধরিয়ে নিলুম।"

সিগারেট লম্বা লম্বা হু'টো টান দিলেন কিরণদা।

"তোমরা তার মানে সবাই চোর বলো!" সুদেষ্ণা হাসিমুখে বলে উঠল।

সৌতি আর কিরণদা হু'জনেই বেজায় চমকে গেল। বলে কি মেয়েটা। সুদেষ্ণা পিছন ফিরে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে আশপাশের বাড়িঘর লক্ষ্য করতে করতেই বলল, "চোর নয় তো কি? বিনা পয়সায় দিব্যি রোদ্দুর চুরি করে নিচ্ছ। তোমরা যাই বলো, এটা মোটেই আমাদের দেশ নয়। এটা বাবা রোদ্দুর চোরের দেশ।"

হো-হো করে হেসে কিরণদা সুদেষ্ণাকে জড়িয়ে ধরে। "সত্যি তোমার খুব বুদ্ধি।" বোনের কাণ্ড দেখে মনে মনে সৌতিও গর্ব বোধ করে।

কিরণদা বলে, "কিন্তু সুদেষ্ণা—আমি যদি বলি তোমরাও তোমাদের দেশে রোদ্দুর চুরি করো, তাহলে?"

"আমরাও রোদ্দুর চুরি করি? তার মানে?"

"সেই তো মজা। আমরা সরাসরি চুরি করি, তোমরা লুকিয়ে চুরিয়ে বা না-জেনেই করো।"

বলে কি লোকটা! মুখে আর কথা সরে না ওদের।

"খুব অবাক হয়ে গেলে? দাঁড়াও, বুঝিয়ে বলছি। শক্তি কাকে বলে জানো তো? যে-কোন কাজ করতে গেলেই শক্তি লাগে। হাঁটা-চলা-ছোটা—এর জন্যেও লাগে। আমাদের এই শক্তি যোগায় খাদ্য। আবার এরোপ্লেন বা গাড়ি ছোটে যে তার জন্যেও লাগে

শক্তি। আলো জ্বালতে, পাখা চালাতেও লাগে শক্তি। তোমাদের পৃথিবীতে খাদ্য ছাড়া কয়লা, তেল এবং গ্যাসই প্রধানত এইসব শক্তি যোগায়। কিন্তু কয়লাই বলো কি তেলই বলো কি গ্যাসই বলো, সবই এই সূর্যের দৌলতে।"

সুদেষ্ণা প্রশ্ন করল, "খাদ্যও তাই ?"

"নিশ্চয়। সূর্যের আলো ছাড়া কি গাছ বাঁচতে পারে ? গাছেরা পাতার সাহায্যে সূর্যের শক্তিকে গ্রহণ করে। তার থেকেই তাদের পুষ্টি। তাই আমরা ফলমূল যা-ই খাই না কেন সেই সূর্যের শক্তিই খাচ্ছি।"

"কয়লা তেল আর গ্যাসের সঙ্গে সূর্যের কি সম্পর্ক ?" এবার সৌতি প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "এক কথায় বলা যেতে পারে বহুকাল আগে অনেক অনেক গাছ আর পুরনো দিনের অতিকায় সব প্রাণী মাটির তলায় চাপা পড়েছিল। তারপর পৃথিবীর মাটির নীচে চাপে, তাপে নানা রকম পরিবর্তন হয়ে তার থেকেই তৈরি হয়েছে কয়লা, তেল আর গ্যাস। গাছের মধ্যেও সূর্যশক্তি জমা আছে, প্রাণীর দেহেও সূর্যশক্তি জমা আছে—তাই এই সূর্যশক্তিরই বিভিন্ন রূপ কয়লা, তেল আর গ্যাস।"

"আচ্ছা কিরণদা, জল-বিদ্যুৎ তো শুধু নদীর হু-হু করে বয়ে যাওয়া জল থেকেই তৈরি হয়। এর মধ্যেও কি সূর্যশক্তির ব্যাপার আছে নাকি ?" বিজ্ঞের মতো প্রশ্ন করল সৌতি। এই ক'দিন আগে বাবা-মার সঙ্গে দার্জিলিঙে গেছল সুদেষ্ণা আর সৌতি। সেখানকার জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ওরা দেখে এসেছে। সুযোগ পাওয়া মাত্র বিদ্যে জাহির করতে আর দেরী করেনি।

"নিশ্চয় আছে। সূর্যের তাপ ছাড়া—" হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, "এক কাজ করা যাক। এখনো সময় আছে। চলো, আগে বরং বিজ্ঞান মিউজিয়ামটা ঘুরে

আসা যাক। তোমাদের এত প্রশ্নের উত্তর আমি ভালভাবে দিতে পারবো না।”

ভদ্রলোকের শেষ কথাগুলো ভালভাবে শোনেনি সৌতি। ওর দৃষ্টি পড়েছিল ভদ্রলোকের রিস্টওয়াচের দিকে। ঘড়িটা অদ্ভুত। সুদেষ্ণাকে হাত ধরে টান দিয়ে সৌতি বলল, “এই ছাখ্ ছাখ্—ঘড়িটার কাঁটা নেই।”

সুদেষ্ণা ভদ্রলোকের ডান হাতটা ধরে ঘড়ি শুদ্ধ কবজিটা সোজা করে ধরল। “তাই তো—এ যে ঠিক ক্যালেণ্ডারের মতো ক’টা সংখ্যা।” সুদেষ্ণা বলে উঠল। দেখতে দেখতে 10-35 লেখাটা পাল্টে 10-36 হয়ে গেল, তারপর 10-37। সুদেষ্ণা ঘড়িটা কানের কাছে ঠেকিয়ে বলল, “কোন শব্দও নেই।”

ভদ্রলোক বললেন, “এর নাম ডিজিটাল ঘড়ি। বিদ্যুৎ-শক্তিতে চলে। আর এই বিদ্যুৎ আসছে ছোট্ট একটা সৌর ব্যাটারি থেকে।”

“সৌর ব্যাটারি ?”

“হ্যাঁ। তোমরা টর্চের ব্যাটারির কথা নিশ্চয় জানো। টর্চের ব্যাটারিতে রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। সৌর ব্যাটারিও বিদ্যুৎ তৈরি করে, তবে সেটা রাসায়নিক শক্তি থেকে নয়, সূর্যরশ্মি থেকে। এই ছোট্ট ছোট্ট ব্যাটারিগুলো এক বছর অন্তর একবার করে বার করে নিয়ে সূর্যের আলোয় বেশ খানিকক্ষণ রাখতে হয়। তাতেই আবার ওগুলো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ফের এক বছর ব্যবহার করা যায়। সহজে এ ঘড়ি খারাপও হয় না।”

“সূর্যের আলো থেকে কি করে…” সুদেষ্ণাকে প্রশ্ন করতে না দিয়েই কিরণদা বলে উঠলেন, “সব বলবো। আগে মিউজিয়ামটা দেখে আসি চলো। ও হ্যাঁ—সবার আগে তোমাদের দুটো কালো চশমা দরকার। এসো আমার সঙ্গে।”

এক হাতে সৌতি আর অন্য হাতে সুদেষ্ণাকে ধরে কিরণদা এগোতে শুরু করলেন। “যতক্ষণ না দোকান থেকে তোমাদের

কালো চশমা কিনে দিচ্ছি একটুও মুখ তুলে তাকাবে না। চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।”

“কেন ?”

“কেন আবার! দেখছো না বাড়িতে বাড়িতে প্রতিফলক থেকে কি রকম আলো ঠিকরোচ্ছে ?”

“প্রতিফলক মানে কি ?” সুদেষ্ণার প্রশ্নের ভাণ্ডার অফুরন্ত।

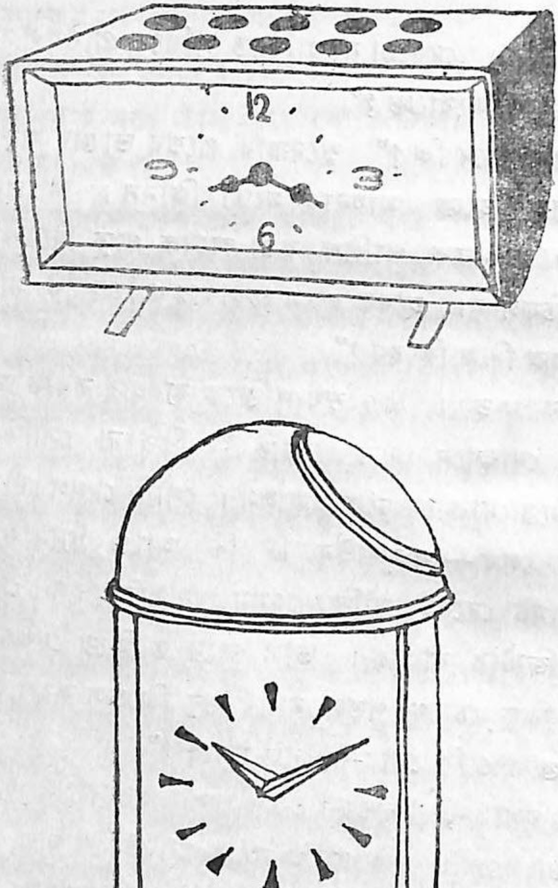
“প্রতিফলক হচ্ছে আয়নার মতো জিনিস। আলো পড়ে ছিট্‌কে যায়। চকচকে পালিশ করা অনেক ধাতু দিয়েও তৈরি করা যায় প্রতিফলক। হরেক রকম চেহারার প্রতিফলক আছে।”

“প্রতিফলক দিয়ে কি হয় ?”

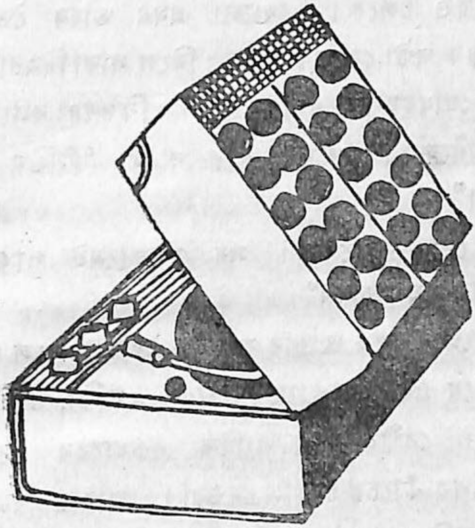
“অনেক কাজ হয়। এও সূর্য-শক্তিকে ব্যবহার করার জন্যেই। পরে বলব, দোকানে এসে পড়েছি।” কিরণদা সৌতি আর সুদেষ্ণাকে নিয়ে দোকানে ঢুকে পড়লেন। সৌতি দেখল দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা—‘সান্‌শাইন্‌ টি ভি অ্যাণ্ড ট্র্যানজিস্টার’। দোকানের নামটা দেখেই সৌতির কেমন যেন সন্দেহ হল। দোকানে একটা ট্র্যানজিস্টার বাজছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখল সৌতি কিন্তু নতুন কিছু চোখে পড়ল না। তবু জিজ্ঞেস করল, “টি ভি ট্র্যানজিস্টারগুলোও কি সৌর-শক্তিতে চলছে ?”

কিরণদা বললেন, “নিশ্চয়। এও সৌর-ব্যাটারির ব্যাপার। ঠিক ওই ঘড়ির মতো। ওই ছ্যাখো না, দু’টো টেবিল-ঘড়ি, রেকর্ড-প্লেয়ার আর রেডিও—সবগুলোর মাথাতেই গোল-গোল চাকতি বসানো আছে। ওই চাকতির ওপর রোদ পড়লেই বিদ্যুৎ তৈরি হয়। সেই বিদ্যুৎ থেকেই কলকব্জা চলে। পরে তোমাদের এই চাকতিগুলোর ব্যাপারে বুঝিয়ে বলবো। এখন শুধু জেনে রাখো এগুলোর নাম ‘সোলার সেল’ বা সৌর-ব্যাটারি।”

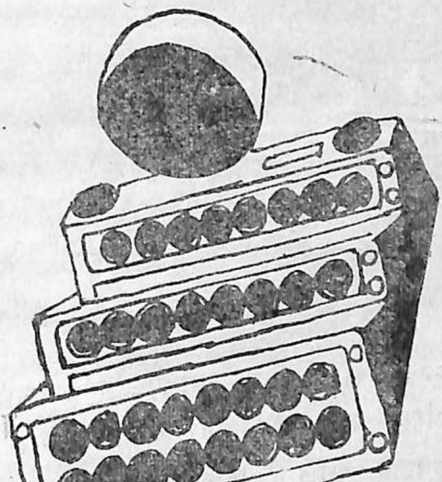
“কিন্তু, রাত্তির বেলায় তাহলে রেডিও বাজবে কি করে ? ঘড়িও তো বন্ধ হয়ে যাবে!” সুদেষ্ণা বলল।



দু' ধরনের সৌর-ঘড়ি



সৌর রেকর্ড-প্লেয়ার



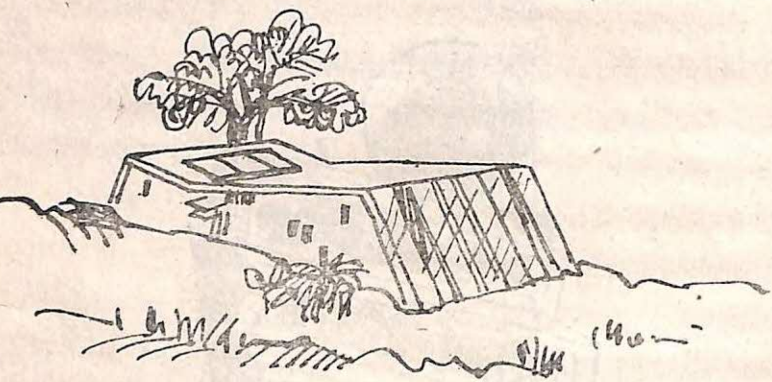
সৌর-আলো

"না—রাত্তিরেও চলবে। এগুলো এমন ভাবে তৈরি যাতে দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টা রোদ্দুর খাইয়ে নিলে সারা দিনরাত চলে।"

দোকানদার বোধহয় কিরণদার চেনা। কিরণদা বলতেই দু'টো চশমা বার করে দিলেন। সুদেষ্ণা প্রশ্ন করল, "টিভির দোকানে চশমা বিক্রি হয়?"

"শুধু টিভির দোকানে কেন। সব দোকানেই পাওয়া যায়। চশমা ছাড়া আমরা যে অচল।"

কিরণদার সঙ্গে দু'জনে আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল। কালো চশমা পরে নির্ভয়ে এবার তাকাতে পারছে। সত্যি, ভারী বিদ্‌কুটে লাগছে শহরটা। বেশীর ভাগ বাড়ির একধারের দেয়ালগুলো বেঁকা। তার ওপর কাঁচের ঢাকনা দেওয়া। আবার বিরাট বিরাট আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোর একটা দিক পুরো আয়না-বসানো। আয়না বসানো দেওয়ালগুলোর মাঝখানটা আবার যেন থেবড়ে গেছে। কে যেন ঘুঁষি মেরে পেটের মাঝখানটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

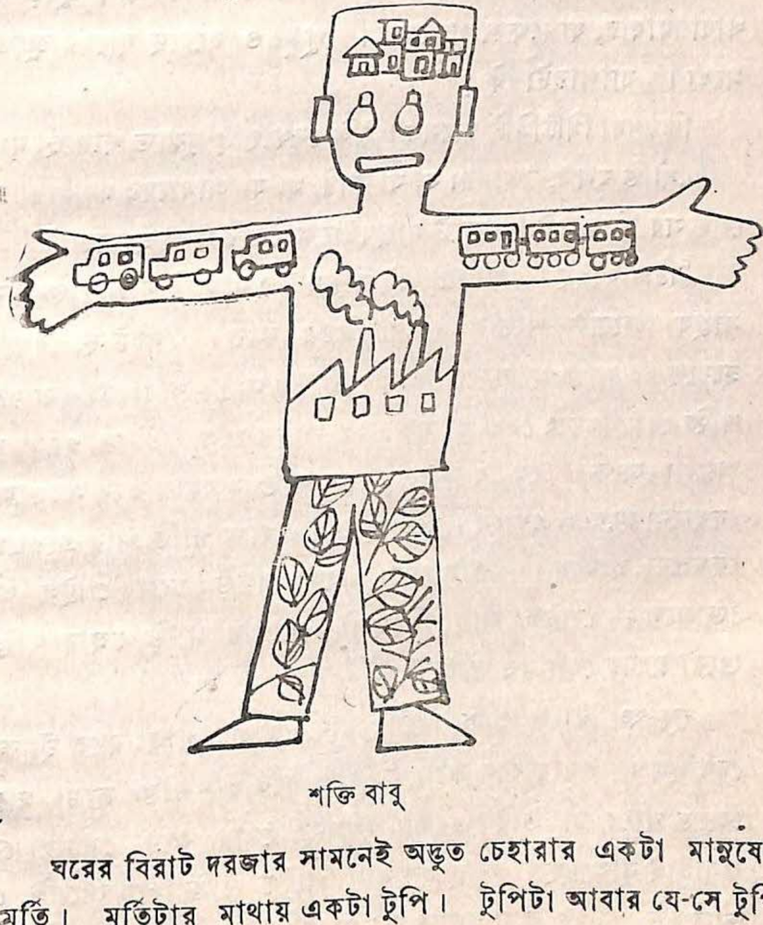


সূর্যাব্দ ৮৯৯-এর কাঁচ-লাগানো, ঢালু দেওয়াল-ওলা বাড়ি

বাড়িঘরের মাঝখানে বেশ খানিকটা করে ফাঁক। আর সবুজ গাছপালায় একেবারে ভর্তি। তবে লম্বা লম্বা গাছের চেয়ে ঝোপঝাড়ের মতো বেঁটে বেঁটে গাছের সংখ্যা বেশী। আর আছে শ্যাওলার সমুদ্র। জায়গা পেলেই যেন চাষ করা হয়েছে। দেখতে দেখতে ওরা মিউজিয়ামের সামনে এসে পড়ল।

কিরণদা বললেন, "মিউজিয়ামে দেখার জিনিস অনেক আছে। কিন্তু সব তো দেখার সময় নেই। আমরা শুধু শক্তি-কক্ষটা দেখবো। চলো, ভেতরে যাই—"

"এই ছাখো। এইটাই শক্তি-কক্ষ।" কিরণদা বললেন।



শক্তি বাবু

ঘরের বিরাট দরজার সামনেই অদ্ভুত চেহারার একটা মানুষের মূর্তি। মূর্তিটার মাথায় একটা টুপি। টুপিটা আবার যে-সে টুপি

নয়। কাঁচের দেওয়াল-ঘেরা একটা বাড়িকে যেন টুপি করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির ভেতরে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পাখা চলছে, ইস্ত্রি গরম হচ্ছে, উনুনে রান্না হচ্ছে। লোকটার চোখ দুটো আবার দুটো ইলেকট্রিক বাল্ব। আলো জ্বলছে। মুখটা একটা টিউব-লাইট। ট্র্যানজিস্টারের কান—প্রচণ্ড কোলাহল সৃষ্টি করছে। লোকটার বাঁ হাতটা একটা ইলেকট্রিক ট্রেনগাড়ি। ডান হাতটা মোটরগাড়ির সারি দিয়ে তৈরি। বিরাট একটা কারখানা দিয়ে তৈরি লোকটার বুক আর পেট। শরীরের বাকী অংশ জুড়ে শুধু খাবারদাবার, ধানক্ষেত, গমক্ষেত। পুকুরও রয়েছে পায়ের জুতোর মধ্যে। ব্যাপারটা কি ?

কিরণদা মিটিমিটি হাসেন। "কি দেখছো ? বুঝতে পারছো না ?"

সৌতি বলল, "আমরা যা-যা করি, যা-যা আমাদের দরকার হয়, সেই সব দিয়ে এই বিদকুটে মানুষটাকে তৈরি করা হয়েছে।"

"ঠিক ধরেছ। আমরা এই মানুষটার নাম দিয়েছি শক্তি বাবু। মানুষ মাত্রেই শক্তির ওপর নির্ভর করে। সেইটাই দেখানো হয়েছে। শক্তি ছাড়া কোন কাজই হয় না। খাবারটা এক রকম শক্তি দেয়, বিদ্যুৎ দেয় আরেকরকম—ট্রেন চলে, হিটার গরম হয়, আলো জ্বলে। যে-যে কাজে মানুষ শক্তি ব্যবহার করে সবগুলোই দেখানো হয়েছে এখানে। এই দ্যাখো, এখানে গাড়ি আর এরোপ্লেন দেখানো হয়েছে। তোমাদের দেশে গাড়ি চলে পেট্রল আর ডিজেলে। পেট্রল আর ডিজেলই যোগায় গাড়ি চলার শক্তি। এরোপ্লেনের বেলায়ও তাই।"

সুদেষ্ণা গালে হাত দিয়ে চোখ গোল গোল করে হাঁ করে দেখছিল। এবার বলে উঠল, "এবার বুঝেছি—শক্তি ছাড়া মানুষ চলতে পারে না তাই এরকম খেলনা তৈরি করে তোমরা সেই কথাটাই বুঝিয়েছ। মানুষের নাম পাল্টে শক্তি দিয়ে দিলেই তো ভাল হত। এত কথা বলতে হত না।"

কিরণদা হাসেন। সৌতি বলে, "খুব হয়েছে আর পাকামি মারিসনি।"

সুদেষ্ণা চোখ কটমট করে তাকাচ্ছে দেখেই কিরণদা বললেন, "এইরে, ঝগড়া শুরু হবে মনে হচ্ছে। চলো চলো—অনেক দেখবার আছে।"

শক্তি কক্ষে ঢুকেই দেখা গেল কাঁচ দিয়ে তৈরি একটা গাছের পাতার ওপরে বিরাট চেহারার একটা কাঁচের গিরগিটি বসে আছে। কাঁচের পাতার রঙটা পাল্টে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আর সেই সঙ্গে গিরগিটিটারও গায়ের রঙ পাল্টাচ্ছে। গিরগিটির বড় বড় চোখ হুটো যেন সিনেমার পর্দার মতো। কতকগুলো শব্দ একবার করে ফুটে উঠছে তারপর মিলিয়ে গিয়ে নতুন শব্দ আসছে।

কিরণদা বললেন, "এই মডেলটার নাম শক্তির রূপান্তর। গিরগিটি যেমন রঙ বদলায় শক্তিও তেমনি রূপ বদলায়। ওই ছাখো—গিরগিটির চোখে শক্তির বিভিন্ন রূপের নাম ফুটে উঠছে।"

গিরগিটির চোখে সত্যিই এক এক করে ফুটে উঠছে শক্তির বিভিন্ন রূপের নাম—তাপ-শক্তি, আলোক-শক্তি, শব্দ-শক্তি, বিদ্যুৎ-শক্তি, গতি-শক্তি, স্থিতি-শক্তি, রাসায়নিক-শক্তি, চৌম্বক-শক্তি, সূর্য-শক্তি, পারমাণবিক-শক্তি।

"এত রকমের শক্তি হয়?" সৌতি বলল।

"শুধু নামগুলো মনে রাখাও তো মুস্কিল।" সুদেষ্ণা যোগ করল।

"এতেই ঘাবড়ে যাচ্ছ! তাহলে এর পরে কি করবে? জানো তো, শক্তি আবার এক রূপ থেকে অন্য রূপ নিতে পারে।"

"কি রকম?" সুদেষ্ণা জানতে চাইল।

"তোমরা তো মটর গাড়ি চড়েছ। মটর গাড়ি কোত্থেকে শক্তি পায় বলতো?"

"কেন? পেট্রল থেকে।"

"ঠিক। এই পেট্রলের মধ্যে আছে রাসায়নিক শক্তি। পেট্রল পুড়লে সেই রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে পরিণত হয়। সেই তাপ শক্তিকে আবার মটর গাড়ির ইঞ্জিন যন্ত্র শক্তি বা গতি শক্তিতে পরিবর্তিত করে।"

"মজার ব্যাপার তো।"

"আরো মজার কথা শুনবে? আমরা জানি ইলেকট্রিক আলো থেকে আমরা আলোক-শক্তি পাই। এই শক্তি কোত্থেকে আসে জানো?"

সৌতি বলল, "বিদ্যুৎ-শক্তি থেকে।"

"বিদ্যুৎ-শক্তি কোত্থেকে আসে?"

সৌতি আর সুদেষ্ণা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

"বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি হয় জেনারেটার যন্ত্রে। এই যন্ত্রের চাকা যান্ত্রিক উপায়ে ঘোরালে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। মানে বৈদ্যুতিক মটরের ঠিক উল্টো। বৈদ্যুতিক মটর আবার বিদ্যুৎ-শক্তিকে পাল্টে যন্ত্রশক্তি করে দেয়—চাকা ঘোরায়।"

"জেনারেটারের চাকা কি লোকে হাত দিয়ে ঘোরায়? সেলাই কল চালানোর মতো?" সুদেষ্ণা গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করল।

"দূর বোকা—মেয়ে না হলে এই বুদ্ধি হয়! যা কিছু হবে অমনি সেলাই ফোঁড়া আর নয়তো পুতুল খেলা। কেন, জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দেখিসনি? জল বেঁধে রেখেছে বাঁধ দিয়ে। আর সেই জল গড়িয়ে পড়ার সময় বিরাট একটা যন্ত্রের চাকা ঘোরাচ্ছে।" সৌতি এতক্ষণে একটু বিদ্যে ফলাতে পেরেছে।

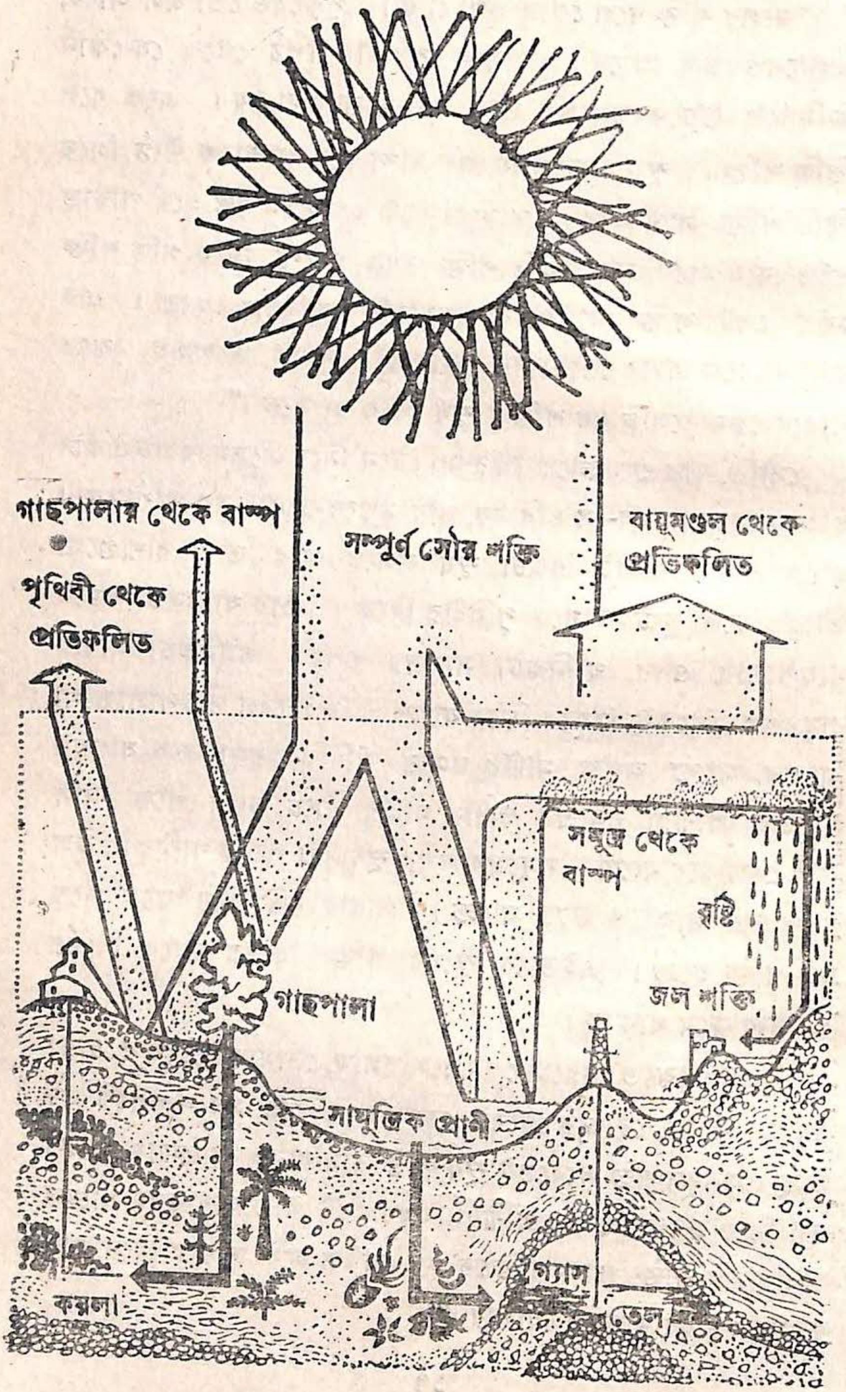
কিরণদা বললেন, "এই বিরাট যন্ত্রের নাম জানো কি? একে বলে টারবাইন। অনেক উঁচু থেকে গড়িয়ে পড়া বা ছুটন্ত জলের শক্তিকে আমরা টারবাইন যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্রশক্তিতে পরিবর্তিত করি। সেই যন্ত্রশক্তি তখন জেনারেটার ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে।"

সৌতি এবার জানতে চাইল, "কিন্তু আপনি যে বলছিলেন জলের এই শক্তিও সূর্য থেকে আসে। কি করে?"

"জলের শক্তি বলে কোন কথা নেই। পুকুরেও তো জল আছে, গেলাসেও জল আছে। আসলে পৃথিবীর পিঠ থেকে যে-কোন জিনিসকে উঁচুতে তুললেই তার মধ্যে শক্তি জমা হয়। একে বলে স্থিতি শক্তি। সূর্যের আলোয় জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে গিয়ে স্থিতি শক্তি লাভ করে। তারপর সেই জল যখন বৃষ্টি হয়ে পাহাড় পর্বত বেয়ে নামে তার স্থিতি শক্তি তখন পাল্টে গিয়ে গতি শক্তি হয়। সেই শক্তি আমরা ব্যবহার করি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। এত কথা না বকে এবার তোমাদের একটা ছবি দেখাই, তাহলেই বুঝতে পারবে কেন বলেছি সব শক্তিই সূর্য থেকে আসছে।"

সৌতি আর সুদেষ্ণাকে কিরণদা টেনে নিয়ে এলেন বিরাট একটা ছবির সামনে। যে-সে ছবি নয়, ছবি নড়ছে-চড়ছে, রঙ পাল্টাচ্ছে। ছবির মাথায় বিরাট একটা সূর্য জ্বলছে আর তার রশ্মিগুলো তীরের মতো ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। তার খানিকটা পড়ছে গাছপালার ওপর, খানিকটা সমুদ্রের ওপর। খানিকটা আবার বায়ুমণ্ডল থেকেই ঠিক্‌রে ফিরে যাচ্ছে। জাঁদরেল গাছপালাগুলো আবার আস্তে আস্তে মাটির তলায় সেঁধিয়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের প্রাণীরা সমুদ্রের তলায় মাটির নীচে চাপা পড়ে গ্যাস আর তেল হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের ওপর সূর্যরশ্মি পড়ায় খানিকটা জল বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। আবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে জল-শক্তি হচ্ছে। এইভাবে সূর্যের শক্তি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকছে।

"এবার বুঝতে পারছো কেন বলেছিলাম, তোমরাও রোদ্দুর চোর? শুধু চোরই নয়, রোদ্দুর খেয়েই তোমরা বড় হচ্ছ, সব পশুপ্রাণী বড় হচ্ছে। ফলমূল শস্য সবেতেই সূর্য শক্তি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যের রূপ নিয়ে জমা হচ্ছে। প্রাণীরা যখন এই খাদ্য খায় তখন খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে তাদের দিয়ে কাজ করায়, বড় হবার শক্তি যোগায়।"


গাছপালায় থেকে বাষ্প
পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত
সম্পূর্ণ সৌর শক্তি
বায়ুমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত
সমুদ্র থেকে বাষ্প
বৃষ্টি
জল শক্তি
গাছপালা
সামুদ্রিক প্রাণী
কয়লা
গ্যাস
তেল

সূর্য থেকে শক্তি

"আচ্ছা কিরণদা—গাছপালা থেকেই যদি কয়লা তৈরি হয় তাহলে আপনারা কয়লা ফুরিয়ে যাবার আগেই আরো গাছপালা মাটিতে পুঁতে দিলেন না কেন ?" সুদেষ্ণা জানতে চাইল।

হো হো করে হেসে উঠলেন কিরণদা। মাটির তলায় চাপা পড়ে গাছেদের কয়লা হতে কতদিন সময় লেগেছে জানো ? লক্ষ কোটি বছর। কাজেই আবার নতুন করে কয়লা তৈরি হবার আশা আর নেই।"

সৌতি এবার প্রশ্ন করল, "গাছেরা কি করে সূর্যের শক্তি নিজেদের মধ্যে জমা করে রাখে ?"

"এই তো বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন। এর উত্তর জানা না হলে কোন কথাই জানা যাবে না। ব্যাপারটা খুব মজার। বলতে গেলে এ-জগতে গাছেরাই সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারণ প্রাণীরা সরাসরি সূর্যালোক থেকে নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। এর জন্যে তাদের গাছের ওপর নির্ভর করতে হয়। এসো, তোমাদের এবার এই জগতের সবচেয়ে বড় কারখানাটা দেখাই।"

"সবচেয়ে বড় কারখানা ? কোথায় কিরণদা, রাশিয়ায় না আমেরিকায় ?"

সুদেষ্ণার প্রশ্নে মিটিমিটি হাসে কিরণদা। "কারখানাটা সারা পৃথিবী জুড়েই রয়েছে।"

"ওরে বাবা। আচ্ছা, বাটা কম্পানি নয় তো ?" সৌতি বলল।

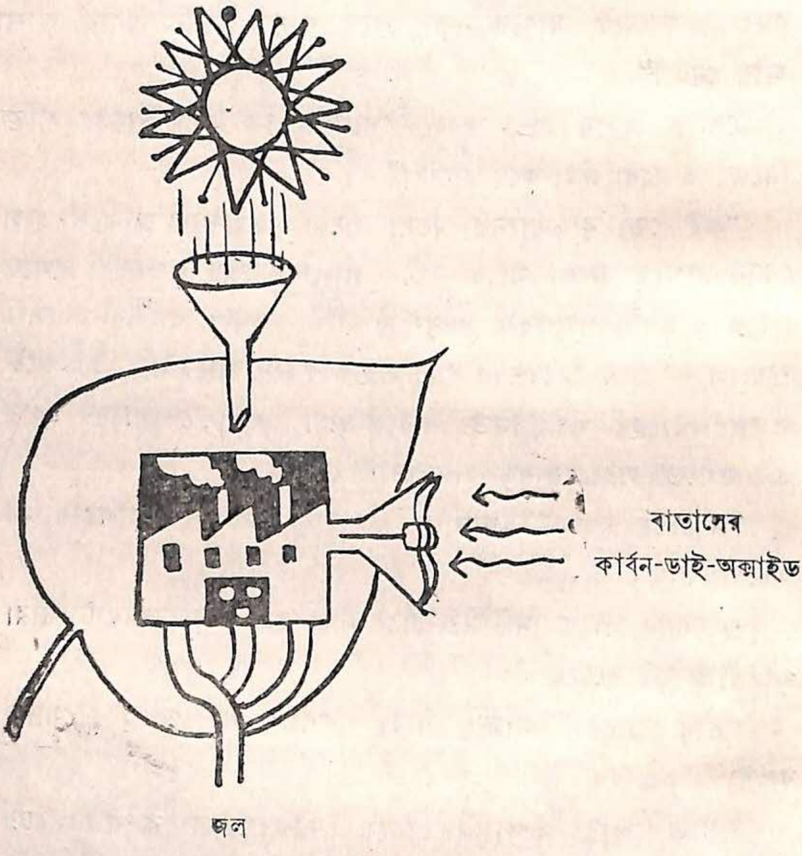
"ধ্যাত্—বাটা কম্পানির চেয়ে কোকাকোলা কম্পানি ঢের বড়। শুনিসনি বাবা বলছিলেন সেদিন, কোকাকোলা কম্পানি দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলো দেশকে প্রায় কিনে রেখেছে।"

"হল না সুদেষ্ণা। হল না। তোমরা কেউই বলতে পারনি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কারখানা গাছের পাতা।"

"গাছের পাতা ?"

"হ্যাঁ—চলো, তোমাদের এবার গাছের পাতার কারখানার কলকব্জা আর কাণ্ডকারখানা দেখাই।"

সৌতি আর সুদেষ্ণাকে কিরণদা এনে দাঁড় করালেন খেলনার আকারের একটা কারখানা বাড়ির সামনে। কারখানা বাড়িটার চেহারাটা ঠিক পাতার মতো। একটা চ্যাপ্টা পাতার পেটটা যেন



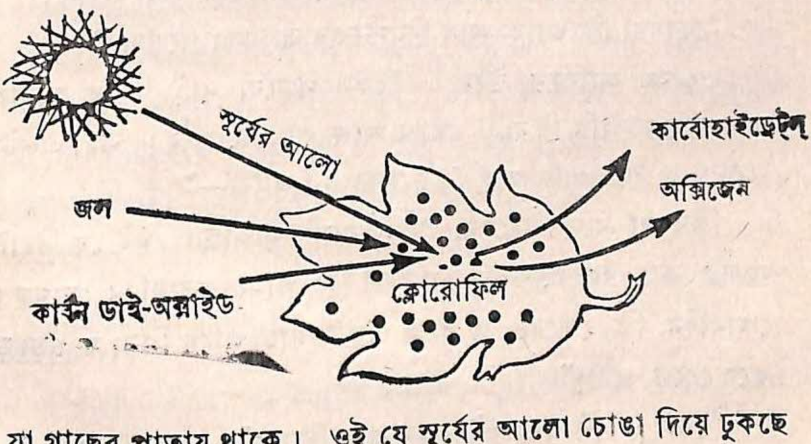
পাতা-বাড়ির কারখানা

উঁচু হয়ে উঠেছে। এই পাতা-বাড়ির মাথায় একটা বিরাট চোঙা। বাড়ির নীচের দিক থেকে অনেকগুলো পাইপ বেরিয়ে মাটির তলায় সেঁধিয়ে গেছে। কিরণদা একটা স্যুইচ টিপতেই বাড়ির মাথার ওপরে সূর্য ঝক্‌মক্ করে উঠল আর সূর্যরশ্মি যেন বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে

লাগল সেই চোঙের মধ্যে। ওদিকে পাইপগুলো দিয়ে কলকল শব্দে জল উঠতে লাগল কারখানা-বাড়ির মধ্যে। বাড়ির মধ্যে সবুজ সবুজ রঙের গোল-গোল দানাগুলো নড়তে চড়তে শুরু করল। ওদিকে কারখানা বাড়ির এক পাশের একটা জানলার ওপরে একটা পাখা ঘুরতে আরম্ভ করেছে বনবন করে।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে সেই কিরণদারই শরণাপণ্য হতে হল ওদের।

"এটা হচ্ছে পাতার কারখানা। এখানে আলোক-সংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য প্রস্তুত হচ্ছে। জানো তো, এই জগতে এ রকম কারখানা মাত্র একটিই আছে। পাতার কারখানাতেই কেবল জড় বস্তু থেকে জীবিত পদার্থ তৈরি হয়। পাতার কারখানায় কাঁচামাল হচ্ছে জল আর হাওয়া। ওই ছাখো, পাইপে করে সেই জল আসছে। গাছ তার শেকড় দিয়ে মাটির তলা থেকে এমনি ভাবে জল শুযে পাতায় পাঠিয়ে দেয়। আর ওই যে ফ্যানটা ঘুরছে, ওটা পাতার কারখানায় হাওয়া সরবরাহ করছে। পাতার কারখানার যন্ত্র হচ্ছে ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিল এক রকম সবুজ কণা



যা গাছের পাতায় থাকে। ওই যে সূর্যের আলো চোঙা দিয়ে ঢুকছে পাতার কারখানায়—ক্লোরোফিল যন্ত্রের সাহায্যে ওই আলোই

জলকে ভেঙে দিচ্ছে। জল থেকে পাওয়া যাচ্ছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। তাছাড়া বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডও ভেঙে চুরে দেওয়া হচ্ছে পাতার কারখানায়। এইভাবেই পাতার কারখানায় তৈরি হচ্ছে সব খাদ্যের মূল বস্তু—গ্লুকোজ। তাছাড়া জলকে ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন করতে গিয়ে উৎপন্ন হচ্ছে শক্তি। এই শক্তি লুকিয়ে থাকে গাছের পাতায়, ডালে, গুঁড়িতে। কাঠ পোড়ালে আমরা সেই শক্তিটাই পাই। সূর্যের শক্তি খাদ্যের মধ্যেও জমা হয়ে থাকে। তাই খাদ্য থেকেও আমরা শক্তি পাই।”

সৌতি আর সুদেষ্ণা একবার কিরণদার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল আর একবার পাতার কারখানার খেলনাটার দিকে।

সুদেষ্ণা বলল, “সত্যি কিরণদা, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আমরাও রোদ্দুর-চোর। রোদ্দুরকে খাবার বানিয়ে খাচ্ছি।”

কিরণদা হাসতে হাসতে বললেন, “তবু কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমাদের একটা বিরাট তফাত আছে। যার জন্যে তোমাদের অনেক ভুগতে হচ্ছে এখন। তোমরা যদি ভাল করে রূপকথা পড়তে তাহলে কিন্তু এমনটা হত না।”

রূপকথা! কিরণদা সত্যিই বড় হেঁয়ালি করে কথা বলেন।

“তোমরা কি জ্যাক আর বিনস্টকের রূপকথা পড়েছ?”

সুদেষ্ণা লাফিয়ে উঠল। “কেন পড়বো না। দেখি আবার মনে করতে পারি কিনা। সেকি আজ পড়েছি, কবে! লম্বা একটা লতা-গাছ বেয়ে প্রায় স্বর্গে উঠে গেছল না জ্যাক—”

কিরণদা বলে উঠলেন, “ব্যস্ ব্যস্—বুঝেছি। ওই যে বিরাট লতার কথা বললে, ওই রকম লতা কি তোমরা কোনদিন দেখেছ? কোনদিন কি ভেবেছ, এ রকম একটা গাছ আছে কিনা যা চড়চড় করে বেড়ে ওঠে?”

“কেন? কি হবে ওই রকম গাছ দিয়ে?” সুদেষ্ণার প্রশ্ন।

“এখনো বুঝলে না! সূর্যের আলোর শক্তি যদি আরো বেশী

করে কাজে লাগাতে হয় তাহলে হয় গাছপালা আরো পুঁততে হবে নয়তো এমন গাছপালা লাগাতে হবে যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। আমরা এখন তাই করছি। সূর্যের আলো থেকে যত রকম উপায়ে সম্ভব আমরা শক্তি সংগ্রহ করে নিচ্ছি। তাছাড়া আমরা এখন ক্লোরোফিলও তৈরি করে ফেলেছি। সেই কৃত্রিম ক্লোরোফিল থেকে তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের শক্তি-কেন্দ্র। পরে তোমাদের ক্লোরোফিল শক্তি কেন্দ্রে নিয়ে যাব। তাছাড়া আমরা গ্রামে যাব যখন দেখবে—আমাদের চাষবাদের কায়দাটাই অন্যরকম। শুধু খাদ্যের প্রয়োজনেই নয়, জ্বালানীর কথাটাও আমরা খুব মনে রাখি গাছপালা লাগানো আর চাষবাষের সময়। চলো—এবার তোমাদের সব শক্তির উৎস সূর্যের সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করিয়ে দিই। সূর্যের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না হলে বুঝতে পারবে না কি করে সূর্য থেকে এত শক্তি পাওয়া যাচ্ছে। তোমাদের দেশে সূর্য এখন যে শক্তি বিতরণ করছে—আমাদের এখানে কয়েক শো বছর পরেও তার কোন হরফের হয়নি। কিন্তু তোমরা সেই শক্তিকে সরাসরি কাজে লাগাতে জানো না। আর আমরা সেই কাজে লাগাবার কায়দাটা আয়ত্ত করে ফেলেছি। এইটাই যা তফাত। এসো—”

বিরাট একটা কাঁচের বলের সামনে ওদের এনে দাঁড় করালেন কিরণদা। একটা সুইচ টিপতেই কাঁচের বলের পেটের মধ্যেটা লাল হয়ে জ্বলে উঠল। ক্রমেই জোর হয়ে উঠতে লাগল লাল আলোটা। শেষকালে চোখ বাঁধানো সাদা আলো হয়ে গেল। ওরা বুঝল এটা নকল সূর্য।

কিরণদা জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা সুদেষ্ণা, তোমার কখনো জ্বর হয়েছে?”

“বারে, এইতো গত বছরেই একদিনে বৃষ্টিতে ভিজে তার পরের দিনই জ্বর এসে গেছল—একশো চার ডিগ্রি।”

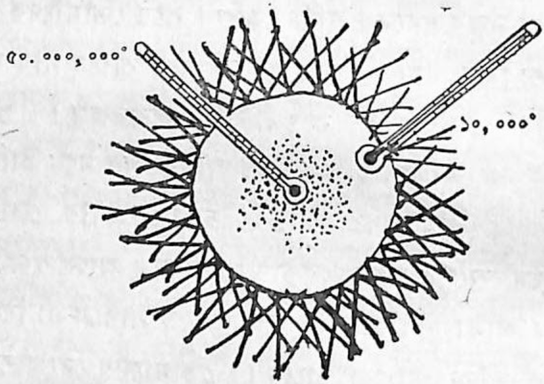
“একশো চার ডিগ্রি! মা-বাবা খুব ঘাবড়ে গেছলেন নিশ্চয়?

কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো, একশো চার জ্বরেই তোমার যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সূর্যবাবুর কি দশা হবে।"

"কেন?"

"ওই দ্যাখো না—"

কিরণদা আঙুল দিয়ে ছুটো থার্মোমিটার দেখালেন। একটা



সূর্যের পেটের মধ্যে আর বাইরের গায়ের তাপমাত্রা

নকল সূর্যের পেটের একেবারে মধ্যিখানে গোঁজা আর আরেকটা ঠিক বাইরের গাটা ছুঁয়ে রয়েছে।

সুদেষ্ণা চোখটা কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "ওরে ব্বাস্– সূর্যের পেটের তাপমাত্রা ৫ কোটি ডিগ্রি। আর পিঠের ওপর দশ হাজার ডিগ্রি।"

সৌতি বিরক্ত হয়ে বলল, "শুধু ডিগ্রি বললেই হল! ফারেনহাইট হিসেবে না সেন্টিগ্রেড হিসেবে বলবি তো, না হলে কোন মানেই হয় না। জানিস না ২১২ ডিগ্রি ফারেনহাইট মাত্র ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সমান।"

"থাক্-থাক্ তোকে আর বেশী বিদ্যে ফলাতে হবে না। আমার জ্বরের কথা যখন বলেছিলাম তখন কি সেন্টিগ্রেড বলেছি—সবাই জানে একশো চার জ্বর বললে ফারেনহাইটই বোঝায়। সূর্যের তাপও ফারেনহাইটেই বলেছি।"

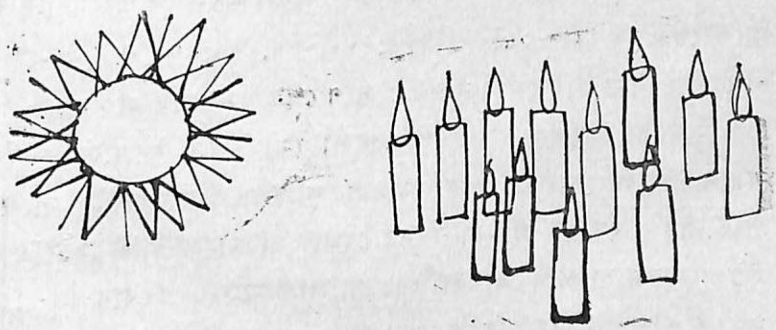
কিরণদা হাসতে হাসতে বলেন, "ঝগড়া তো অনেক হল এবার চলো। ও হ্যাঁ, এ কথাটা কি তোমরা কি জানো যে কাগজ পোড়ানোর সময় তাপমাত্রা ওঠে মাত্র ৪৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট? আর অমন যে কয়লা, সেও মাত্র ১০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে জ্বলে? এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ সূর্যের উষ্ণতা কতটা?"

কিরণদার পিছু ধরে ওরা পাশের ঘরটায় এসে ঢুকল। সারাটা ঘর অন্ধকার, শুধু টিমটিম করে দরজার পাশে একটা মোমবাতি জ্বলছে।

"কি ঘুটঘুটে অন্ধকার রে বাবা।" সুদেষ্ণা বলল। "কিছু দেখতেই পাচ্ছি না, আর আপনি আমাদের বলছেন ভাল করে দেখতে।"

কিরণদা দু'হাতে দুজনকে ধরে ঘরের ভেতরে আরো খানিকটা ঢুকে বললেন, "এবার ভাল করে ভ্যাখো—কিছু চোখে পড়ছে?"

সৌতি বলল, "তুই চোখ দেখা সুদেষ্ণা, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি লাখ লাখ মোমবাতি সাজানো রয়েছে সামনের টেবিলটায়।"



এক ফুট দূরে রাখা ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০টা মোমবাতির আলোর সমান আলো দেয় একা সূর্য

কিরণদা বললেন, "এই সুইচটা তোমরা একবার করে টিপলেই একটা করে মোমবাতি জ্বলে উঠবে। আর কতবার টেপা হচ্ছে

সেই হিসেব রাখবে এই ঘড়িটা। সব ক'টা মোমবাতিকে যদি সুইচ টিপে জ্বালাতে পারো, তাহলে এখানে সূর্যের সমান আলো পাবে।"

কিরণদার কথা শেষ হতে না হতেই সুদেষ্ণা সুইচ টিপতে শুরু করে দেয় পট্ পট্ করে। একটা একটা করে মোমবাতিও জ্বলতে শুরু করে। কিন্তু লক্ষ কোটি মোমবাতি রয়েছে যে, কত আর জ্বালাবে! তিনশো তেরটা মোমবাতি জ্বালাতে গিয়ে তিনশো তেরবার সুইচ টিপেই তার হাত ব্যথা হয়ে গেল।

"দূর—আর পারছিনা।" হাল ছেড়ে দিল সুদেষ্ণা।

"ও কখনো পারা যায় নাকি। সেইজন্যেই তো চেষ্টা করিনি।" সৌতি সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করল। "আচ্ছা কিরণদা—সবশুদ্ধ কটা মোমবাতি জ্বালালে সূর্যের সমান আলো পাওয়া যেত?"

কিরণদা হাত বাড়িয়ে আরেকটা সুইচ টিপতেই মিটারের মধ্যে সংখ্যারা যেন হুলুস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিলে। প্রথমে এল ২, তারপরে ৫, তারপরে একের পর এক শূন্য জমা হতে লাগল ২৫ এর পিঠে। জমা হচ্ছে তো হচ্ছেই—শেষকালে থামল যখন সে এক বিচ্ছিরি আকারের সংখ্যা—২৫,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০ পঁচিশের পিঠে ছাব্বিশটা শূন্য। গুণে শেষ করা যায় না।

কিরণদা বললেন, "ওই অতগুলো মোমবাতি জ্বাললে সূর্যের সমান আলো হবে। তবে আমরা পৃথিবীর পিঠে অতটা আলো পাই না। এখানে আমরা দিনের বেলায় যা আলো পাই সেটা এক ফুট দূরে দশ হাজার মোমবাতির আলোর মতো। এবার আন্দাজ করতে পারছো, সূর্যের শক্তি আর ক্ষমতা কতখানি?"

"সে আর বলতে!" ঘর থেকে বেরোতেই বলল সুদেষ্ণা।

"আচ্ছা কিরণদা—শক্তি আর ক্ষমতা তো একই কথা। তাই না?"

"না—তফাত আছে। এসো এদিকে, দেখাচ্ছি।"

একটা ছবির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। একটা পিঁপড়ে চিনির ডেলা থেকে মুখে করে এক দানা এক দানা করে চিনি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটু দূরে। আর একটা লোক মুঠোয় করে পুরো চিনির তালটা একবারেই সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা ছবির তলায় আরেকটা। ছবি দেখিয়ে কিরণদা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের তো আগেই বলেছি কাজ করতে হলে শক্তি প্রয়োজন। এই ছবিতে দেখো, শেষ পর্যন্ত পিঁপড়েটাও যে কাজ করেছে মানুষটাও তাই করেছে, তার মানে দুজনেরই একই শক্তি খরচ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কি একটা পিঁপড়েরও যা ক্ষমতা, মানুষেরই তাই ?"

"কক্ষণো না। পিঁপড়েটার কত বেশী সময় লেগেছে ওই কাজটা করতে।" সৌতি বলল।

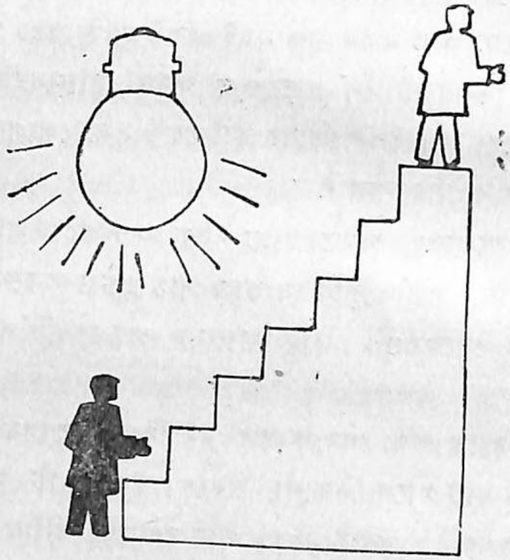
"ঠিক বলেছ। ক্ষমতা হচ্ছে শক্তি খরচ করার সামর্থ্য বা কাজ করার বেগ। পিঁপড়েটা যে কাজ পাঁচ ঘণ্টায় করবে মানুষ হয়তো করবে এক সেকেণ্ডে। তাই মানুষের ক্ষমতা পিঁপড়ের ক্ষমতার চেয়ে..."

কিরণদাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সুদেষ্ণা বলে উঠল, "পাঁচ ইনটু ষাট মানে তিনশো, তিনশো ইনটু ষাট মানে—আঠের হাজার গুণ বেশী। তাই না ? পাঁচ ঘণ্টাকে আমি সেকেণ্ড করে নিয়েছি।"

কিরণদা হাসতে হাসতে বললেন, "গুণটাতো দেখছি বেশ ভালই পারো। এবার এদিকে এসো।"

দোকানের শো-কেসের মতো সামনে কাঁচ বসানো একটা অন্ধকার চেপটা আলমারির সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। কিরণদা সুইচ টিপতেই তিনটে ছবি একসঙ্গে ফুটে উঠল। প্রথম ছবিতে একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলে উঠেছে, তার নীচের ছবিতে একটা মানুষ চোঁ-চোঁ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে আর তিন নম্বর ছবিটায় একটা মগের মধ্যে জল গরম হচ্ছে। জলের

মধ্যে গোঁজা রয়েছে একটা থার্মোমিটার। এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল বাল্বটার গায়ে লেখা আছে—১০০০ ওয়াট, কাঁচের মগে আছে ৮৬০ কে. জি. জল আর লোকটার পিঠে লেখা আছে তার ওজন ৫০ কে. জি.। একটু বাদেই ঢঙ করে একটা আওয়াজ হল আর কে যেন বলে উঠল, 'এক ঘণ্টা হল।' বাল্বটাও সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। লোকটা ইতিমধ্যে সিঁড়ির মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে



১০০০ ওয়াটের বাল্ব এক ঘণ্টা জ্বালাতে যে শক্তি লাগে, সমান শক্তি লাগে ৫০ কে. জি ওজনের একজন লোককে যদি ৭৩৫০ মিটার উঁচুতে উঠতে হয়।

আর কাঁচের মগের তলায় আগুনটাও নিভে গেছে। চোখে পড়ল, উঁচু সিঁড়ির ওপরে মানুষটার পাশে লেখা রয়েছে—৭৩৫০ মিটার। আর জলের মগটার পাশে—১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

'কিছুই যে বুঝতে পারছি না। এসব কি হচ্ছে…' সৌতি বলে ওঠে।

'বুঝতে পারছ না?' কিরণদা বললেন।

সুদেষ্ণা ভুরু কুঁচকে আপন মনে বলে, 'বাড়িতে বাল্ব লাগাবার সময় দেখেছি, কোনটার গায়ে ৬০ ওয়াট লেখা থাকে, কোনটার গায়ে ১০০ ওয়াট। যত ওয়াট বেশী হয় আলোও তত জোর হয়। কিন্তু...'

কিরণদা বললেন, "শোনো, ওয়াট হচ্ছে ক্ষমতার একক। তোমাদের ওজন যেমন পাউণ্ড, সের বা কিলোগ্রামে মাপা হয়, দৈর্ঘ্য যেমন ইঞ্চি, ফুট বা মিটারে মাপা যায় তেমনি ক্ষমতা মাপা হয় ওয়াটের হিসাবে। ওয়াট ছাড়াও, কিলোওয়াট বা অশ্বক্ষমতার একক দিয়েও ক্ষমতা মাপা যায়। এবার তোমরা ছবিটা ছাখো। এই বাল্বটার ক্ষমতা ১০০০ ওয়াট। এক ঘণ্টা ধরে এই ১০০০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্বটাকে জ্বালাতে যে শক্তি খরচ হচ্ছে ঠিক সমান শক্তি খরচ করতে হচ্ছে ৫০ কে. জি. ওজনের এই লোকটাকে ৭৩৫০ মিটার উঁচুতে উঠতে। তাছাড়া, ওই মগের মধ্যে ৮৬০ কে. জি. জলের তাপমাত্রাকে ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াতেও সমান পরিমাণ শক্তি খরচ করতে হচ্ছে।"

সুদেষ্ণা বলে উঠল, 'আচ্ছা কিরণদা, আপনি যে অশ্ব ক্ষমতা না কি যেন বললেন? অশ্ব ক্ষমতাটা কি ব্যাপার?'

কিরণদা বললেন, "তোমাদের গাড়ি আছে?"

সৌতি বলল, "না। তবে আমাদের পাড়ার হাবুলের বাবার আছে। আমাদের সঙ্গে হাবুলতো কথাই বলে না।"

সুদেষ্ণা বলল, "ভারী অসভ্য হাবুলটা।"

কিরণদা হেসে বাধা দেন। "যাক্ গে ওসব কথা। যা বলছিলাম, ওই হাবুলদের গাড়িটার ক্ষমতা কত জানো? এই ধরো, ষোল থেকে আঠারো অশ্ব ক্ষমতার মতো। খুব বড় গাড়ি হলে অবশ্য কুড়ি থেকে চব্বিশ অশ্ব ক্ষমতাও হতে পারে। এই যে ছবিতে ১০০০ ওয়াটের বাল্বটা দেখছ, এরকম তিনটে ১০০০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালালে সেটা ৪ অশ্ব ক্ষমতার সমান হবে।

অশ্ব ক্ষমতার একক ব্যবহার করে সাধারণতঃ যন্ত্রপাতির ক্ষমতা মাপা হয়।”

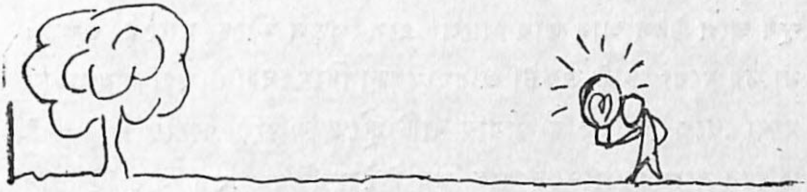
বক্তৃতা শুনতে শুনতে সুদেষ্ণা বোধহয় অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। কিরণদাকে বলল, “আচ্ছা কিরণদা, আমরা তো এসেছিলাম সূর্যের কথা জানতে। এসব কথা আমার একটুও ভাল লাগছে না।”

“বাঃ, তা বললে হয়! এগুলো না জানতে পারলে যে সূর্যের ক্ষমতা বা শক্তির কথা বুঝতেই পারবে না। এবার এদিকে এসো।”

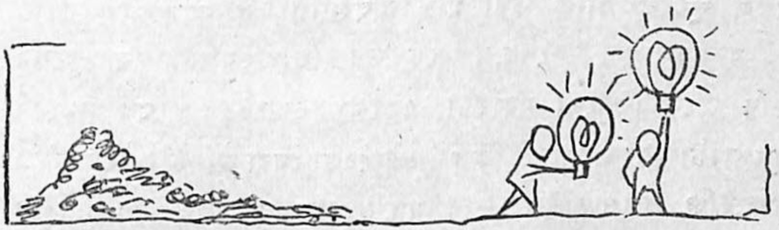
কিরণদা এবার ওদের আরেক সারি ছবির কাছে নিয়ে এলেন। “সবচেয়ে ওপরের ছবিটায় ছাখো, একটা গাছ রয়েছে আর একটা বাল্ব রয়েছে। তার তলারটায় রয়েছে কয়লা আর তুটো বাল্ব। তার নীচেরটায় রয়েছে ইউরেনিয়াম ২৩৫, মানে অ্যাটম বোমার জ্বালানী। আর তারো নীচে হাইড্রোজেন বোমার জ্বালানী ডয়টেরিয়াম। এবার কি কি লেখা রয়েছে ছাখো ছবিগুলোর তলায়। ১ গ্রাম কাঠ পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় সেটা একটা ১০০ ওয়াটের বাল্ব ১ মিনিট জ্বালানোর সমান। ১ গ্রাম কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় সেটা তু'টো একশো ওয়াটের বাল্ব ১ মিনিট জ্বালানোর সমান। ১ গ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে পাওয়া শক্তি একটা ছোটখাট শহরে ১ ঘণ্টা ধরে আলো দিতে পারে (২০,০০০ বাল্ব জ্বালিয়ে) আর ১ গ্রাম ডয়টেরিয়াম থেকে পাওয়া শক্তি একটা বিরাট শহরের পাঁচ লক্ষ অধিবাসীকেও (১৫০,০০০ বাল্ব জ্বালিয়ে) ১ ঘণ্টা ধরে আলো দিতে পারে।”

“কি কাণ্ড! এক গ্রাম কাঠ আর এক গ্রাম ডয়টেরিয়াম থেকে পাওয়া শক্তির মধ্যে এত তফাত!” সুদেষ্ণা তাজ্জব।

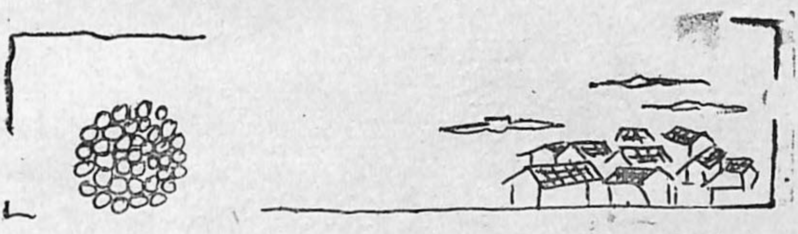
“সেই জন্যেই তো অ্যাটম বোমা অত ভয়ঙ্কর আর তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হাইড্রোজেন বোমা।” কিরণদা বললেন। “বিভিন্ন জ্বালানী থেকে কিরকম শক্তি পাওয়া যায় তার একটা তুলনামূলক ধারণা পেলে তো? এবার এসো, সূর্যের শক্তি কতখানি দেখে যাও।”



১ গ্রাম কাঠ=১০০ ওয়াট বাল্ব×১ মিনিট ('০০১৮ কিলোওয়াট-ঘণ্টা)



১ গ্রাম কয়লা=ছ'টো ১০০ ওয়াট বাল্ব×১ মিনিট ('০০৩৭ কিলোওয়াট-ঘণ্টা)



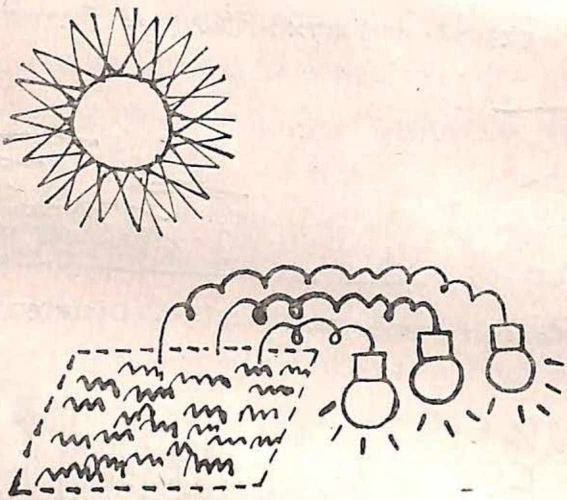
১ গ্রাম ইউ-২৩৫=২০ হাজার বাল্ব×১ ঘণ্টা (২০,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা)



১ গ্রাম ডয়টেরিয়াম=১৫ লক্ষ বাল্ব×১ঘণ্টা (১৫০,০০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা)

(ডয়টেরিয়ামকে ভারী হাইড্রোজেনও বলা হয়। পারমাণবিক ফিউশান প্রক্রিয়ার অন্যতম এই উপাদানটিকে সাধারণত জল থেকে সংগ্রহ করা যায়)

কিরণদা একটা সুইচ টিপতেই সামনের মডেলটার মধ্যে নকল সূর্য জ্বলে উঠল আর তার আলো এসে পড়ল নীচে মাঠের ওপর। মাঠের মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঘেরা জায়গাটার মধ্যে থেকে দুটো তার আবার মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে আর সেই তারের সঙ্গে লাগানো রয়েছে তিনটে বৈদ্যুতিক বাল্ব। বাল্ব তিনটের প্রত্যেকটার গায়ে লেখা ১৩,০০০ ওয়াট। কিরণদা সুইচ টিপে নকল সূর্যকে জ্যান্ত করা মাত্র বাল্বগুলো দপ্ করে জ্বলে উঠল। কিরণদা বললেন, "দেখেছ, তিনটে তের হাজার ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে। তার মানে তিনশো নব্বইটা একশো ওয়াটের বাল্বের সমান। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ কি? ওই বেড়া-ঘেরা জমিটার দৈর্ঘ্য মাত্র এক ইঞ্চি, প্রস্থও তাই। তার মানে মাত্র এক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ



১ বর্গ-ইঞ্চি জমির ওপর সূর্যের যে-টুকু কিরণ এসে পড়ে তাকে পুরোপুরি বিদ্যুতে রূপান্তরিত করতে পারলে ৪০,০০০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালা সম্ভব।

জায়গার ওপর সূর্যের যেটুকু রশ্মি এসে পড়েছে তার শক্তিটুকুকে পুরোপুরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে ৩৯০টা ১০০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালানো যাবে।"

"কী সাংঘাতিক ব্যাপার!" সৌতির চক্ষুস্থির।

কিরণদা কিন্তু ওর কথায় কোন কানই দেন না। সূর্যের কথাই বলে চলেন। "সূর্য একটা বিরাট বলের মতো। এত বড় তার আকার যে দশ বারো লক্ষ পৃথিবীর জায়গা হতে পারে সেখানে। একটা চরকির মতো অনবরত খালি পাক্ খাচ্ছে। ভুঁই চরকি যেমন পাক্ খায় আলের ওপর, ঠিক তেমনি বলা যেতে পারে সূর্য পাক্ খায় তার অক্ষ-র ওপর। এই রকম পাক্ খেতে খেতেই সূর্য চারধারে বিকিরণ করছে শক্তি। অনেকটা চরকি যেমন ফুল্কি ছেটায় আরকি। সূর্যে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে তার সামান্য একটা অংশ শুধু পৃথিবী ও এই সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহদের ওপর এসে পড়ে। কিন্তু পরিমাণে এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী শক্তি মহাবিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই, যা আমাদের কোন কাজেই লাগছে না। এখানে একটা কথা জানা বিশেষ দরকার। সূর্য থেকে এই শক্তি কিভাবে আসছে। আমরা বলি সূর্য থেকে শক্তির বিকিরণ হচ্ছে। আলো এই বিকীর্ণ শক্তির একটা অংশ মাত্র। আলো ছাড়াও এই বিকিরণের মধ্যে থাকে অনেক অদৃশ্য আলো, যেমন ইন্‌ফ্রারেড তরঙ্গ (অবলোহিত তরঙ্গ) ও আলট্রাভাওলেট তরঙ্গ (অতিবেগনী তরঙ্গ) ইত্যাদি। আলোও এক প্রকার তরঙ্গ যা আমাদের চোখে দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করে। এখন মজা কি জানো, এইসব তরঙ্গ যতক্ষণ না কোন কঠিন বস্তুর ওপর এসে পড়ছে, কোন বস্তু তাদের শুষে নিচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু তাপ হিসেবে আমরা তাদের অনুভব করতে পারি না। সেই জন্যেই সূর্যের বিকিরণ মহাশূন্য পেরিয়ে আসছে কিন্তু মহাশূন্য তেতে উঠছে না, তেতে উঠছে আমাদের পৃথিবী। কারণ, এই বিকিরণ এসে পড়ছে আমাদের পৃথিবীর গায়ে। একটা কথা সব সময় মনে রাখবে। আমরা যখনই বলব সূর্য কিরণ থেকে 'এত' শক্তি পাওয়া যাচ্ছে বা 'এত' কাজ করা যাচ্ছে তার মানে কিন্তু আমরা শুধু সূর্যের আলোর কথা বলছি না। সূর্যের

শক্তি বলতেই আমরা সূর্যের শক্তি বিকিরণের কথা বুঝি। তাই তার মধ্যে যেমন আলোও আছে, অদৃশ্য আলোও আছে।”

কিরণদা নাগাড়ে বকতে বকতে যেই একটু দম নিতে চুপ করেছেন সৌতি বলে উঠল, “আচ্ছা কিরণদা, আপনি যে এই অদৃশ্য আলোর কথা বলছেন, এক্স-রেও তো এক রকম অদৃশ্য আলো, তাই না? হাড়-টাড় ভেঙে গেলে এক্স-রে দিয়ে ছবি তোলে না?”

“ঠিক বলেছ। এক্স-রেও এক ধরনের অদৃশ্য আলো। সূর্যের বিকিরণের মধ্যে এক্স-রেও আছে। সূর্যের বিকিরণের মধ্যে এমন আরো অনেক অদৃশ্য আলো আছে যা আমাদের পৃথিবীর পিঠ অবধি এসে পৌঁছতে পারে না, বায়ুমণ্ডল থেকেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়।”

“তার মানে বায়ুমণ্ডলের বাধা না থাকলে আমরা আরো বেশী শক্তি পেতে পারতাম সূর্যের কাছ থেকে?” এবার সুদেষ্ণার প্রশ্ন।

“তা পারতাম কিন্তু বায়ুমণ্ডলের এই বাধার আবার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। সূর্যের বিকিরণের মধ্যে এমন অনেক ধরনের অদৃশ্য আলো আছে যা মানুষ এবং জীবজগতের পক্ষে ভয়ংকর। সেদিক দিয়ে বায়ুমণ্ডল আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে একটা ভারী সুন্দর জামা। যাকৃগে, আসল কথাটায় আসা যাক। সূর্যের কাছ থেকে পৃথিবী কতটা শক্তি পাচ্ছে? সূর্যের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের পৃথিবীটা এতই ছোট এবং আমরা এত দূরে আছি যে সূর্যের বিকীর্ণ শক্তির দু'শো কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। এরও অর্ধেক আবার বায়ুমণ্ডল থেকেই প্রতিফলিত হয়ে যায়, বাকী অর্ধেক এসে পৌঁছয় পৃথিবীর পিঠ পর্যন্ত। সূর্যের হিসেবে এই সামান্য শক্তিটুকু কিন্তু আমাদের হিসেবে মোটেই সামান্য নয়। সূর্যের কাছ থেকে পৃথিবী যে শক্তি পাচ্ছে সেটা পুরোপুরি কাজে লাগানো গেলে আমরা $১০^{১৮}$ অশ্ব-ক্ষমতা,

মানে ১০-এর পিঠে আঠারোটা শূন্য বসালে যত হয়, অত অশ্ব ক্ষমতা পেতে পারি। বাস্তবে কিন্তু ঠিক তা ঘটে না। পৃথিবীর পিঠে যে সৌর-শক্তি এসে পড়ছে তার শতকরা তিরিশ ভাগই আবার দিনের বেলা ফেরত চলে যায় মহাশূন্যে—পৃথিবীর পিঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ও গাছপালার নিশ্বাসের সঙ্গে। মনে রেখো, গাছপালারা তাদের বৃদ্ধির জন্যে যেটুকু আলো ব্যবহার করে তার হাজার গুণ কিন্তু তারা এইভাবে নষ্ট করে, মানে বাতিল করে দেয়। সূর্যশক্তির বাকী সত্তর শতাংশ নানা রকম কাজে লাগে। পনেরো শতাংশের মতো মাটি, বালি, পাহাড়, জমি ইত্যাদিকে উত্তপ্ত করতে গিয়ে খরচ হয়। বাকী পঞ্চান্ন শতাংশ গিয়ে পড়ে সমুদ্র ও জলভাগের ওপর। ফলে সমুদ্রের জলের উপরিভাগ তপ্ত হয়ে উঠে শেওলা ও নানারকম জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক হয় আর জল থেকে উৎপন্ন হয় বাষ্প। এই বাষ্পই আবার যখন জমে মেঘ হয় তখন খানিকটা তাপ বেরিয়ে আসে তার থেকে। সেটাও হারিয়ে যায় মহাশূন্যে। তবে, কিছুটা শক্তি অবশ্য মেঘ সৃষ্টিকারী জলকণার মধ্যে থেকেই যায়। সেই জন্যেই যখন বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টির জলকে সরাসরি সমুদ্র ফিরে যেতে না দিয়ে মাঝপথে কোনো জলাধারে রেখে দেওয়া হয়। সেই আটকানো জলের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে শক্তি। এই বন্দী শক্তিকে কাজে লাগানো হয় জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে, যন্ত্রের চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করার কাজে। কিন্তু সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া শক্তির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র এইভাবে কাজে লাগানো গেছে। বহু রকমের প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসাতে হয় তাই ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে আরো বেশী করে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনেরও তেমন কোন সম্ভবনা নেই।”

সুদেষ্ণা বলে উঠল, “কিরণদা, আপনি যা বলছেন তাতে সূর্যের প্রচণ্ড শক্তির কথা বুঝতে পারছি কিন্তু তার সবটাই তো মনে

হচ্ছে শুধু শুধুই নষ্টই হয়ে যাচ্ছে। কাজে লাগাবার মতো শক্তি তাহলে পাচ্ছেন কোত্থেকে আপনারা?"

কিরণদা হাসেন। "সূর্যের কাছ থেকে প্রচুর শক্তি পেয়ে, তার বেশীর ভাগ নষ্ট করেও আমাদের যা আছে সেটাও কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর। এবার সেই কথাই বলি। তোমরা বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক জোলিও কুরির নাম শুনেছ?"

"কুরি? মাদাম কুরির নাম শুনেছি কিন্তু..."

"মাদাম কুরির মেয়েকে ইনি বিয়ে করেছিলেন। ইনিও নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। শুধু বৈজ্ঞানিক হিসেবেই নয়, মহান মানুষ হিসেবে, সাহসী যোদ্ধা হিসেবেও ফ্রেডারিক জোলিও কুরির নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজি দস্যুদের বিরুদ্ধে প্যারিসে যখন মুক্তি-যোদ্ধারা প্রাণ পণ করে লড়ছেন তখন ইনি সারাক্ষণ ছিলেন তাদের পাশে পাশে। ল্যাবরেটরি থেকে রাসায়নিক পদার্থ এনে একের পর এক তৈরি করেছিলেন আগ্নেয় বোমা। এবার আসল কথায় আসি। ফ্রেডারিক জোলিও কুরি বহুকাল আগে সূর্যের শক্তিকে ব্যবহার করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে রাশিয়ায় তাঁর বন্ধু-বিজ্ঞানীদের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন, 'মিশরের মতো একটা দেশের ওপর সূর্যের যে-শক্তিটুকু এসে পড়ে তার দশ ভাগের এক ভাগকেও আমরা যদি উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজে লাগাতে পারি তাহলে বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলো মিলে যত শক্তি উৎপাদন করছে তার সমান পরিমাণ শক্তি আমরা পেতে পারি।'"

"এটা কি সত্যি কথা কিরণদা?" সৌতি প্রশ্ন না করে পারে না।

"অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। তোমাদের আরো অবাক হবার মতো কথা শোনাচ্ছি। তোমাদের পৃথিবীতে এখনো যা কয়লা আছে তা যদি নিমেষের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলা যায় তবে তার থেকে কি

প্রচণ্ড পরিমাণ ক্ষমতা লাভ করা যায় আন্দাজ করতে পারছো নিশ্চয় ? এবার শোনো, এই প্রচণ্ড ক্ষমতার হাজার গুণ ক্ষমতা আমরা পেতে পারি যদি শুধু সাহারা মরুভূমির ওপর যে সূর্য-শক্তি এসে পৌঁছচ্ছে তার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়। আরো শোনো, সারা পৃথিবীর দশ ভাগের এক ভাগ জমির ওপর সূর্যের যে শক্তি এসে পৌঁছচ্ছে তার শতকরা তিন ভাগকেও যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে আর অন্য কোন জ্বালানী, অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন পড়বে না। এমন কি পৃথিবীর লোকসংখ্যা যদি বেড়ে দু'গুণও হয়, তবু নয়।"

হাঁ করে কিরণদার কথাগুলো যেন গিলছিল সুদেষ্ণা। চোখ বড় বড় করে এবার প্রশ্ন করল, "কিন্তু সূর্য এত শক্তি পাচ্ছে কোত্থেকে কিরণদা ?"

"তোমরা হিরোশিমা আর নাগাসাকির নাম শুনেছ নিশ্চয় ?"

সৌতি বলল, "হ্যাঁ—জাপানের এই শহর দু'টোর ওপর আমেরিকা অ্যাটম বোমা ফেলেছিল।"

"ঠিক বলেছ। শহর দুটো একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মুখে। আমেরিকা তার সামরিক ক্ষমতা জাহির করে পৃথিবীর আর সব দেশকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। তাদের পদানত করে রাখবার জন্যেই এই কাণ্ডটি তারা ঘটিয়েছিল। তারপরে অবশ্য অ্যাটম বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর আরেক বোমা তৈরি হয়েছে—তার নাম হাইড্রোজেন বোমা। কি অ্যাটম বোমা, কি হাইড্রোজেন বোমা, দুটোকেই পারমাণবিক বোমা বলা হয়। পারমাণবিক ফিশান ঘটিয়ে অ্যাটম বোমা আর পারমাণবিক ফিউশান বিক্রিয়া থেকে হাইড্রোজেন বোমা—উঁচু ক্লাশে উঠে এসব পড়বে। এখন এইটুকু জেনে রাখো, আমাদের ভাগ্য ভাল তাই অ্যাটম বোমার দাদা, এই হাইড্রোজেন বোমা এখনো মানুষের মাথার ওপর পড়েনি। শুধু মাটির তলায় ফাটিয়ে পরীক্ষা করা

হয়েছে। সূর্যের পেটের মধ্যে কিন্তু এই রকম অসংখ্য হাইড্রোজেন বোমা অনবরত ফেটেই চলেছে। হাইড্রোজেন এক রকম গ্যাস—পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে এই গ্যাস যখন হিলিয়াম গ্যাসে পরিবর্তিত হয় তখন প্রচণ্ড এফ বিস্ফোরণ ঘটে আর সেইসঙ্গে বেরিয়ে আসে বিস্তর তাপশক্তি। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পোড়ালেও শক্তি উৎপন্ন হয় কিন্তু একই পরিমাণ হাইড্রোজেনকে যদি হিলিয়াম করে দেওয়া যায় তাহলে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা আগের চেয়ে ১৫০,০০০,০০০ গুণ বেশী। এইভাবে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম হবার পর খানিকটা পদার্থ কিন্তু একেবারে লোপাট হয়ে যায়।”

“কয়লা পুড়ে যেমন ছাই হয়ে যায়, তাই না কিরণদা?” সুদেষ্ণা বলে উঠল।

“না, ঠিক তা নয়। কয়লা পুড়ে ছাই হবার সময় পদার্থ লোপাট হয়ে যায় না। বাতাসের অক্সিজেন আর কয়লার কার্বনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে কয়লা পোড়বার সময়। পোড়ার পর যেসব গ্যাসগুলো বেরোয় ও যে-ছাইটা পড়ে থাকে সেগুলোর যা ওজন, পোড়ার আগে কয়লা আর পোড়ার কাজে ব্যবহৃত অক্সিজেনের ওজন—এ দুই সমান। কিন্তু সূর্যের পেটে হাইড্রোজেন হিলিয়াম হবার সময় খানিকটা পদার্থ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। এই পদার্থটা ধ্বংস হয়েই সৃষ্টি হয় শক্তি। সূর্যের মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে এইভাবে কতটা করে পদার্থ উধাও হয়ে যাচ্ছে জানো? চল্লিশ লক্ষ টন! কিন্তু এত পদার্থ নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সূর্য কিন্তু আরো তিন হাজার কোটি বছর একইভাবে আলো আর তাপ বিকিরণ করতে থাকবে।”

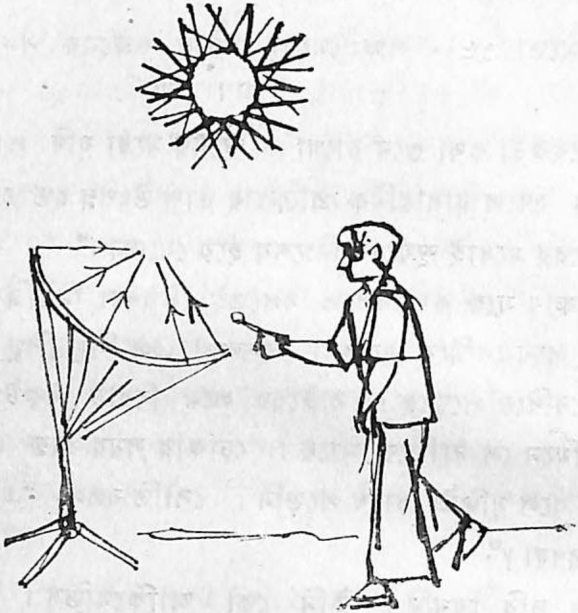
‘ওরে ব্বাস্! সেকেণ্ডে চল্লিশ লক্ষ টন! আমার ওজন তো মোটে পঁচিশ কেজি। তার মানে এক টনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

আমার মতো ১৬০০ লক্ষ মেয়ের সমান ওজনের পদার্থ ফুরিয়ে যাচ্ছে!"

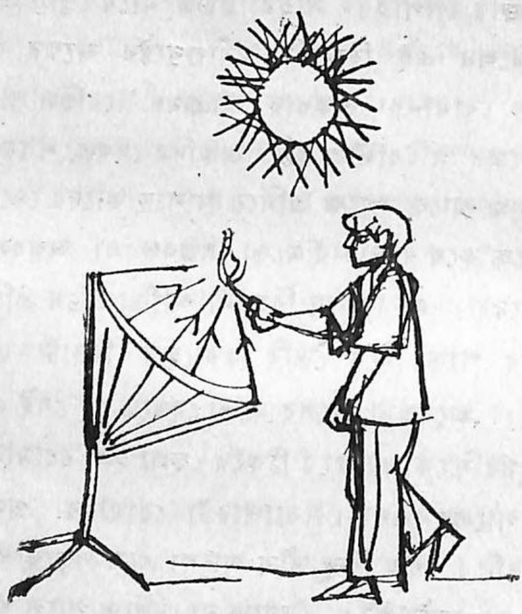
"আরেকটা কথা শুনে রাখো। সূর্যের মধ্যে যদি পারমাণবিক প্রক্রিয়ার বদলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হত তাহলে মাত্র ১০০ বছরের মধ্যেই সূর্যদেব নিঃশেষ হয়ে যেতেন।"

সুদেষ্ণার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই কিরণদা মিউজিয়াম থেকে বাইরের লনে বেরিয়ে এলেন। সুদেষ্ণা এল পিছু পিছু। সৌতি আগেই বেরিয়ে পড়েছে। বাইরের লনে বিরাট একটা পাথরের মূর্তির সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঢোকার সময় অন্য গেট দিয়ে ঢুকেছিল বলে মূর্তিটা চোখে পড়েনি। সৌতি বলল, "এই মূর্তিটা কার কিরণদা?"

"এঁর ছবি দেখনি? ইনি তো আর্কিমেডিস। পৃথিবীতে সূর্যের শক্তিকে উনিই প্রথম কৃত্রিম ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। সে ভারী মজার ব্যাপার। সাইরাকিউজ্ নামে ছোট্ট একটা দ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন এই বিজ্ঞানী। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় দু'শো বছর আগে রোমানরা একবার আক্রমণ করেছিল সাইরাকিউজ। সাইরাকিউজের অধিবাসীরা হঠাৎ একদিন দেখল, শ'য়ে শ'য়ে পাল-তোলা জাহাজ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তাদের দেশের দিকে। শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো সৈন্যবল বা অস্ত্রবল কোনটাই ছিল না তাদের। এই বিপদে বিজ্ঞানী আর্কিমেডিস এগিয়ে এলেন। তিনি ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি করালেন বিরাট এক অবতল প্রতিফলক। অনেকটা ঢালের মতো দেখতে। সেই প্রতিফলকের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে ঘন করে ঠিকরে ফেলা হল রোমান জাহাজের কাপড়ের পালের ওপর। ব্যাপারটা রোমানরা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি। এক বিন্দু তীব্র আলো এসে পড়ছে পালের ওপর, তাতে আর হয়েছেটা কী! দেখতে না দেখতে পালে ধরল আগুন। একের পর এক জাহাজগুলো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এমন



অবতল প্রতিফলকের ফোকাস বিন্দুতে ধরেনি বলে,
দেশলাই কাঠি জ্বলছে না।



অবতল প্রতিফলকের ফোকাস বিন্দুতেই ধরতেই
দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠেছে।

নিঃশব্দ সাংঘাতিক আগ্নেয় অস্ত্রের সামনে রোমানরা আর দাঁড়াতে সাহস করল না। তারা রণে ভঙ্গ দিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সূর্যশক্তি ব্যবহারের এমন অভিনব চিন্তা যাঁর মাথায় আসে, কী অসাধারণ প্রতিভা তাঁর নিশ্চয় বুঝতে পারছো!'

আর্কিমেডিসের দাড়িওলা মুখটার দিকে তাকিয়ে সুদেষ্ণা বলে, "আচ্ছা কিরণদা, প্রতিফলক দিয়ে আগুন ধরানো আর আতস কাঁচ দিয়ে আপনার সিগারেট ধরানো দু'টোই তো একই ধরনের ব্যাপার, তাই না?"

"ঠিকই বলেছ সুদেষ্ণা। সূর্যের আলোয় আতস কাঁচ ধরলে সূর্যরশ্মি ওই কাঁচ ভেদ করে আসার সময় বেঁকে গিয়ে একটা বিন্দুতে এসে জড় হয়। ওই জায়গাটাকে বলে ফোকাস বিন্দু। ওই ফোকাস বিন্দুতে একটা কাগজ বা দেশলাই কাঠি রাখলে সেটা আপনা হতে জ্বলে ওঠে। ঠিক একই ভাবে প্রতিফলকের গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যরশ্মি প্রতিফলকের ফোকাস বিন্দুতে জড়ো হয়। আর্কিমেডিসের প্রতিফলকের ফোকাস বিন্দুটা জাহাজের ওপর পড়েছিল বলেই পালে আগুন ধরেছিল।"



আতস কাঁচের ফোকাস বিন্দুতে রাখলে
কাগজে আগুন ধরানো যায়

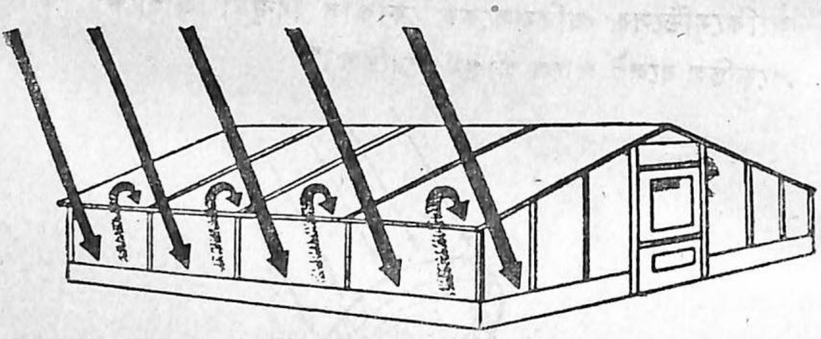
মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে সৌতি আর সুদেষ্ণাকে নিয়ে কিরণদা চললেন তাঁদের দেশের বাড়ি দেখাতে। রাস্তায় যেতে যেতেই ডানধারের একতলা একটা কাঁচের ছাদওলা বাড়ির দিকে আঙুল তুলে কিরণদা জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি বলতো ?"

সুদেষ্ণা বলে, "এটা নিশ্চয় অর্কিড হাউস। দার্জিলিঙে একবার দেখেছিলাম।"

"ঠিক বলেছ।" কিরণদা হেসে বলেন, "এই অর্কিড হাউস বা গ্রীণ হাউসের মাথায় কাঁচের ঢাকা দেওয়া থাকে কেন জানো ?"

"গাছগুলো যাতে আলো পায়।" সৌতি বলল।

"শুধু আলোই নয়, তাপও পায়। তাছাড়া সূর্যের কিরণ কাঁচ দিয়ে যত সহজে ভেতরে ঢুকে আসে তত সহজে কিন্তু ভেতর থেকে



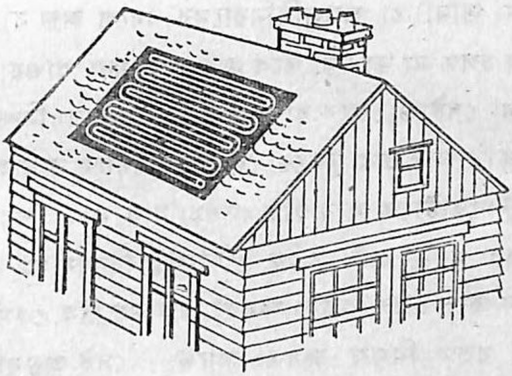
সূর্যের কিরণ কাঁচের আবরণ গলে ভেতরে
ঢুকছে কিন্তু বেরোতে পারছে না।

বাইরে বেরোতে পারে না। অনেকটা চক্রব্যূহের মতো ব্যাপার। কাঁচের বাড়িটা এখানে চক্রব্যূহ আর সূর্যকিরণ অভিমন্যু। ভেতরে ঢুকতে পারে, বেরোতে পারে না। এই ঘটনাটাকে আমরা খুব

কাজে লাগাই সূর্যের কিরণ থেকে তাপ সংগ্রহ করার জন্যে। চলো —ওই সামনের বাড়িটায় গিয়ে ঢুকি। তাহলেই সব বুঝতে পারবে।"

কিরণদা ওদের একটা বাঙলো ধরনের দোচালা একতলা কাঠের বাড়ির কাছে নিয়ে এলেন।

"এই ছাখো—এই আমাদের রোদ্দুর বাড়ি। ছাতের ওপর কি রয়েছে দেখতে পাচ্ছ? এক কাজ করি—চলো, ওই সিঁড়িটা দিয়ে ছাতে উঠে যাই। তাহলেই বুঝতে পারবে।"



রোদ্দুর বাড়ির মাথায় কাঁচের বাক্স

ছাতে চড়ে দেখা গেল বাড়ির মাথায় দক্ষিণ দিকে মুখ করে রয়েছে কাঁচের ঢাকাওলা সারি সারি চেপটা চেপটা বাক্স। একটা বাক্সের ঢাকা তুলে ধরলেন কিরণদা। বাক্সটার তলায় রয়েছে মিশমিশে কালো রঙ করা একটা ধাতুর পাত। এই পাতের ওপরে জোড়া রয়েছে সরু একটা ধাতব পাইপ। পাইপটা U-এর মত চেহারা ক'রে বারবার এঁকেবেঁকে চলে গেছে এধার থেকে ওধার। পাইপটাও কালো রঙ করা। বাক্সর ঢাকনাটার ওপর লাগানো রয়েছে একজোড়া কাঁচ। কাঁচ ছটোর মাঝখানে ইঞ্চি খানেকের মতো ফাঁক।

বাক্সগুলো কাঠের তৈরি। কিরণদা জানালেন, পাইপগুলো তামার আর তলায় যে পাতটার সঙ্গে ওগুলো ঝালাই করা রয়েছে সেটা অ্যালুমিনিয়াম।

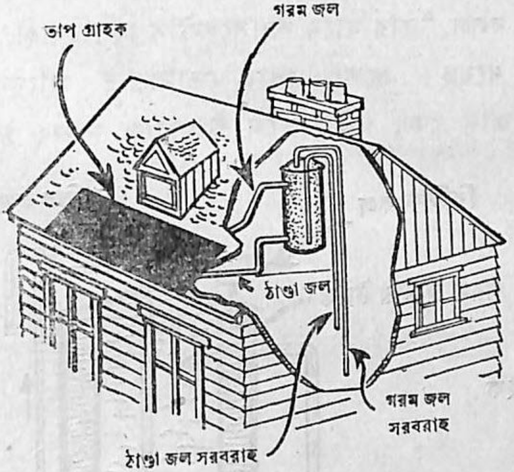
সৌতি প্রশ্ন করল "পাইপটা তামার না হলে বা পাতটা অ্যালুমিনিয়ামের না হলে কি হত ?"

কিরণদা বললেন, "ওই আঁকাবাঁকা পাইপের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা জল পাঠানো হয়। সেই জলটা সূর্যের কিরণ থেকে তাপ টেনে তেতে আগুন হয়ে ফিরে যায়। বুঝতেই পারছ, পুরো ব্যবস্থাটাই হচ্ছে শুধু সূর্যের তাপকে যতখানি সম্ভব কাজে লাগানোর জন্যে। এখন এখানে তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের বদলে অন্য ধাতু ব্যবহার করলেও কাজ চলত না তা নয়, তবে এত ভাল ফল পাওয়া যেত না। কেন যেত না সেটাও জেনে রাখা ভাল। তোমরা নিশ্চয় দেখেছ, এক টুকরো কাঠ আর এক টুকরো লোহাকে রোদে রাখলে কিছুক্ষণ পর লোহার টুকরোটাতে আর হাত দেওয়া যায় না। কাঠটা কিন্তু অত গরম হয় না। এটা হচ্ছে পদার্থের বিশেষ ধর্ম। কাঠ ও লোহার যেমন তাপ গ্রহণ করার ক্ষমতা এক নয় ঠিক তেমনি বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন রকম নিজস্ব ক্ষমতা আছে। সেই অনুযায়ী আমরা দেখেছি তামা আর অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে, অ্যালুমিনিয়াম ও তামা সুপরিবাহী, তাই এগুলো ব্যবহার করা হয়।"

মন দিয়ে কিরণদার কথা শুনছিল সৌতি। কিরণদা থামতেই প্রশ্ন করল, "কিরণদা, এই পাইপ, ধাতুর পাত - সব কালো রঙ করা কেন ? তাছাড়া একজোড়া কাঁচের ঢাকনাই বা কেন লাগানো হয়েছে ?"

"কালো রঙ বেশী তাপ টানে। জানতো, মরুভূমির দেশের লোকেরা সাদা রঙের জামা পরে। সাদা জামা পরলে কম গরম লাগে। একটা সাদা রঙ করা লোহার পাত আর একটা কালো

রঙ করা লোহার পাত যদি খানিকক্ষণ রোদ্দুরে বসিয়ে রাখো তো দেখবে কালো লোহার পাতটা সাদার চেয়ে অনেক বেশী গরম হয়েছে। আর জোড়া কাঁচের ঢাকনা কেন দেওয়া হয়েছে জিজ্ঞেস করছো? আগেই বলেছি, কাঁচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের রশ্মির ভেতরে ঢুকতে তেমন কোন অসুবিধে হয় না কিন্তু সেই রশ্মি ভেতর থেকে বাইরে বেরোতে খুব বাধা পায়। একটার জায়গায় দুটো কাঁচ ব্যবহার করলে সেই বাধা আরো বাড়ে। দুটো কাঁচের ঢাকার মধ্যে খানিকটা হাওয়া আটকে থাকে। হাওয়াও অপরিবাহী, ফলে সূর্যের তাপকে ওই বাক্সের মধ্যে বেশ ভালভাবেই আটকে ফেলা যায়।"



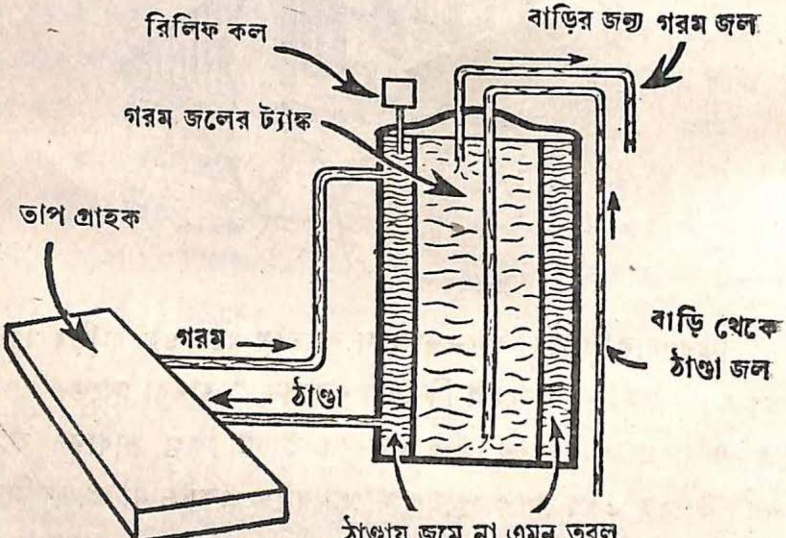
কিরণদার পিছনে পিছনে ছাত থেকে নেমে এসে ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকল। নামতে নামতেই কিরণদা বললেন, "তোমরা ছাতের ওপর যে তাপ-গ্রাহক দেখলে তার ঢাকনার কাঁচটা কিন্তু সাধারণ কাঁচ নয়। কাঁচের ওপর থেকে সূর্যের আলো যাতে একটুও না প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়, তার জন্যে বিশেষ এক ধরনের স্বচ্ছ রাসায়নিক পদার্থের আবরণ লাগানো আছে। একে বলা হয় প্রতিফলন-নিবারক রঙ বা কোটিঙ। একই ভাবে তাপগ্রাহক বাক্সের তলায় যে কালো অ্যালুমিনিয়াম পাতটা রয়েছে তার ওপরও আরেক

ধরনের কোটিঙ লাগানো আছে। সেটার আবার কাজ হচ্ছে সূর্যকিরণকে আরো ভালভাবে শুষে ফেলা যাতে যত কম সম্ভব তাপ প্রতিফলিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।”

কিরণদার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে ওরা দেখল একটা বিরাট জলের ট্যাঙ্ক থেকে কিভাবে ঠাণ্ডা জল পাঠানো হচ্ছে ছাদের তাপগ্রাহকে। তারপর ফুটন্ত গরম জল নেমে আসছে আরেকটা পাইপ দিয়ে। এই পাইপটা আবার সাদা রঙের। কিরণদা বললেন, “গরম জলের পাইপে অ্যাসবেস্টাস জড়ানো আছে। তা না হলে পাইপে করে আসতে আসতেই ওটা অনেক ঠাণ্ডা হয়ে যেত।”

সৌতি বলল, “তার মানে অ্যাসবেস্টাস অপরিবাহী, তাই না?”

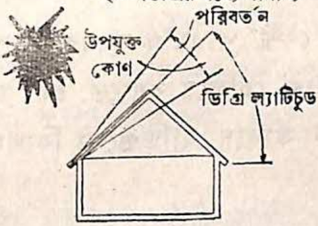
“ঠিক ধরেছ। চলো, এবার তোমাদের আরেকটা জিনিস দেখাই। জান তো, এই অঞ্চলে শীতকালে দারুণ ঠাণ্ডা পড়ে।



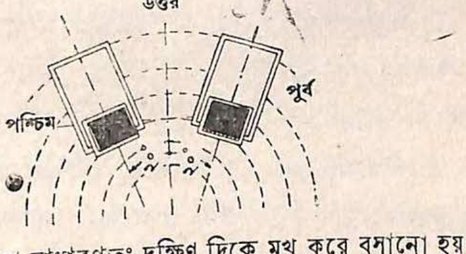
বরফের দেশে জল-গরমের ব্যবস্থা

তখন জল জমে বরফ হয়ে যায়। সেই সময় এই ভাবে সূর্যের তাপ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জল জমে গেলে সেটাকে তো

আর পাইপ দিয়ে পরিবাহিত করা সম্ভব নয়। এই ছাখো, এটা একটা অন্য ট্যাঙ্ক। এর মধ্যে এমন একটা তরল আছে যেটা ঠাণ্ডায় জমবেনা। এই তরলটাকে তাপগ্রাহকে পাঠিয়ে গরম করে বাড়ির ভেতরে আনা হয়। তারপর উত্তপ্ত তরলটা সেই তাপ বিনিময় করে জলের সঙ্গে। জল গরম হয়, তরলটা ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা



পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে রোদ্দুর বাড়ির চালগুলোর ঢাল হবে এক-এক রকম। যাতে সবচেয়ে বেশী রোদ্দুর পায় তাপগ্রাহক। এর জন্যে মানচিত্র থেকে জেনে নেওয়া দরকার কোন্ জায়গার ল্যাটিচুড কত।



তাপ গ্রাহকগুলো সাধারণতঃ দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসানো হয় যাতে সারাদিন ধরে রোদ্দুর পায়। তবে ২০ ডিগ্রির মতো পুব বা পশ্চিমে সরে বসলেও তেমন কোন অসুবিধা হয় না।

তরল আবার ছাতে গিয়ে গরম হয়ে ফেরত আসে। বুঝতে পেরেছ তো ?"

সৌতি আর সুদেষ্ণা এবার বাইরে বেরিয়ে এল। কিরণদা বললেন, "আশেপাশে যত বাড়ি দেখছ সবগুলোতেই এই রকম জল গরমের ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা—বলতো, এই যে বাড়িগুলো দেখছ, নতুন কিছু চোখে পড়ছে ?"

সৌতি আর সুদেষ্ণা কোন কথা বলছেনা দেখে কিরণদা বলল, "ভাল করে ছাখো, তাপগ্রাহক বসানো বাড়ির ছাদগুলো একদিকে হেলানো। সারাদিন ধরে আকাশে সূর্যের অবস্থান এক থাকে না। সেইজন্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সূর্যের তাপগ্রহণ করার জন্যে বিশেষ একটি কোণে হেলিয়ে বসাতে হয় তাপগ্রাহকগুলোকে। তাছাড়া ওই একই কারণে বাড়িগুলো বিশেষ একটা দিকে মুখ করে রয়েছে।"

সৌতি এগোতে এগোতে বলল, "আচ্ছা কিরণদা, এত জল ফুটিয়ে কি লাভ হচ্ছে? চানের জল আর কাপড়-কাচা ছাড়া অন্য কিছুই তো হচ্ছে না।"

সুদেষ্ণা বলে উঠল, "কেন, রান্নাবান্নার কাজও তো হতে পারে।"

"শুধু তাই নয়, এইভাবে তাপ সংগ্রহ করে ঠাণ্ডা দেশের বাড়ি গরম করা হয় আর গরম দেশে করা হয় বাড়ি ঠাণ্ডা।"

"তার মানে তাপ নিয়ন্ত্রক রেফ্রিজারেটারও চলে রোদ্দুর দিয়ে?" সৌতি তাজ্জব। এ যেন গায়ে গরম জল ঢেলে হি-হি করে কাঁপার কথা বলছেন কিরণদা।

"চলেই তো। তবে রেফ্রিজারেটার চালাবার সময় একটু অন্য ধরনের তাপগ্রাহক ব্যবহার করা হয়। বাড়ির ছাদে যে তাপগ্রাহক-গুলো দেখেছ, ওগুলোকে বলে 'ধাতুর পাতের গ্রাহক' বা 'ফ্ল্যাট প্লেট কালেক্টর'। রেফ্রিজারেটার চালাতে গেলে সাধারণতঃ 'প্রতিফলক তাপগ্রাহক' লাগে।"

"যেগুলো পেট চেপটা ঢালের মতো দেখতে হয় তো?" সুদেষ্ণা বলল।

"আর চকচকে পালিশ করা।" সৌতি যোগ করল।

"ঠিক বলেছ। ওই ছাখো, পাশের ছাদের কোণে একটা ঝকঝক করছে। ওটা সূর্যের কিরণ এক জায়গায় জড়ো করে প্রচণ্ড উত্তপ্ত করছে একটা তরলকে। ওই তরলটাকে ব্যবহার করেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটা ঘর ঠাণ্ডা করে বা রেফ্রিজারেটারে বরফ জমায়।"

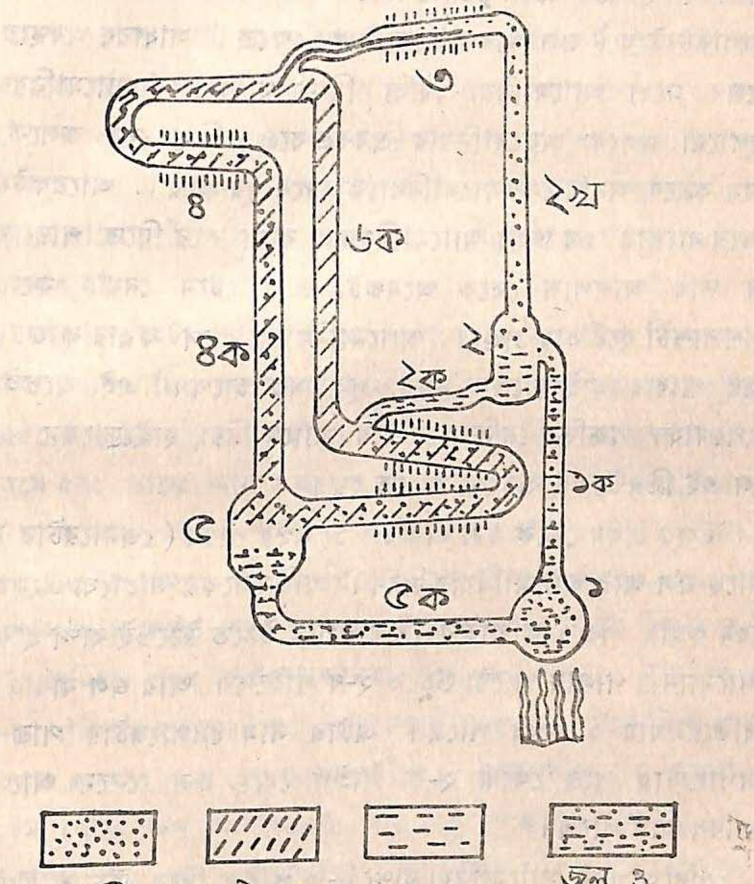
"গরম দিয়ে ঠাণ্ডা করার ব্যাপারটা কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না কিরণদা।" সুদেষ্ণা বলল।

"অবাক হবার কিছু নেই। তোমাদের দেশে এমন এক ধরনের রেফ্রিজারেটার আছে যেখানে কেরাসিনের বাতি জ্বেলে, কি গ্যাসবাতি জ্বেলে বা ইলেকট্রিক হিটার ব্যবহার করে খাবার জিনিস ঠাণ্ডা করা হয়। এখানেও সেই একই পদ্ধতিতে ঘর ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। তবে তেল, গ্যাস বা বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার না করে তার বদলে আমরা সূর্যশক্তি কাজে লাগাচ্ছি।

"তোমরা জান তো, কাঁচের পাত্রে বা কাঁসার পাত্রে জল রাখার চেয়ে মাটির কলসীতে জল রাখলে সেটা বেশী ঠাণ্ডা হয়। কেন জানো? কলসীর ভেতরের জল মাটির ছোট ছোট ছেঁদা গলে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বাইরে আসে। তারপর চোঁয়ানো জলটা বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। জল বা-কোন তরল বাষ্প হবার সময় খানিকটা তাপ টেনে নেয়। মাটির কলসীর গা থেকে চোঁয়ানো জলের ফোঁটাও তাই কলসীর গা থেকেই খানিকটা তাপ শুষে নিয়ে বাষ্প হয়। ফলে কলসীটা তখন হয়ে যায় ঠাণ্ডা। রেফ্রিজারেটারও চলে এই একই পদ্ধতিতে। তবে সেখানে জলের বদলে অন্য একটা তরল কাজে লাগানো হয়। রেফ্রিজারেটার সাধারণতঃ দু' ধরনের হয়। কম্প্রেসার ধরনের ও অ্যাবসর্বার ধরনের। কম্প্রেসার ধরনের রেফ্রিজারেটারে একটা ইলেকট্রিক মোটর লাগে কিন্তু অ্যাবসর্বার বা তাপশোষণ ধরনের রেফ্রিজারেটারে কোন মটর লাগে না। আমরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাপশোষণ পদ্ধতিরই সাহায্য নিই।"

কিরণদার কাছ থেকে তাপশোষণ পদ্ধতিতে রেফ্রিজারেটার যন্ত্র চালাবার কৌশল জেনে নিল সৌতি আর সুদেষ্ণা। কিরণদা একটা ছবিও এঁকে ফেললেন। এর মধ্যে ১-লেখা পাত্রটার তলায় আগুনের শিখার মতো দেখানো হয়েছে। আসলে প্রতিফলকের সাহায্যে এই ১-লেখা পাত্রটার গায়েই সূর্যের আলো ফেলা হয়। যাতে পাত্রটা ওঠে তেতে। এই পাত্রটাকে বলে জেনারেটার।

কিরণদা বললেন, কিছু তরল পদার্থের একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে। তারা ঠাণ্ডা অবস্থায় কোন রকম গণ্ডগোল না বাধিয়েই বিশেষ



১—জেনারেটার
২—সেপারেটার
৩—কন্‌ডেনসার
৪—ইভাপোরেটার
৫-ক পাইপের ঠিক ওপরে—অ্যাবসরবার

একটা পদার্থের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে পারে। কিন্তু যেই তাদের গরম করবে অমনি তারা আর অন্য পদার্থটিকে সহ্য করতে পারবে না। ঠিক ঠেলে ঠুলে সেটাকে বার করে দেবে। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে জল আর অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে। সাধারণ অবস্থায় জলের মধ্যে অ্যামোনিয়া দিব্যি মিশে থাকে। (অ্যামোনিয়া মেশানো জলকে অ্যামোনিয়ার দ্রবণও বলে) কিন্তু যেই জলকে গরম করবে, অমনি সে অ্যামোনিয়াকে দেবে দূর করে। আরেকটা মজার ব্যাপার হল তরল অ্যামোনিয়াকে বাষ্প করে দিতে পারলে সে তার আশপাশ থেকে অনেকটা তাপ টেনে নেয়। ফলে আশপাশটা হয়ে যায় ঠাণ্ডা। অ্যামোনিয়াকে বাষ্প করার কাজটা করে আবার হাইড্রোজেন গ্যাস, খুব অল্প চাপে। এই জন্যেই তাপশোষণ পদ্ধতির রেফ্রিজারেটারে অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ও জল এই তিনটিকেই ব্যবহার করতে হয়।

এবার প্রথম থেকে ধরা যাক। ১ নম্বর পাত্রে (জেনারেটার) আছে জল আর অ্যামোনিয়ার দ্রবণ। প্রতিফলকের সাহায্যে এদের গরম করার পর ১-ক পাইপ দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতেই বাষ্প হয়ে অ্যামোনিয়া পালায় আরো উঁচুকে ২-খ পাইপে। আর জল বাবাজী থিতিয়ে যায় ২ নম্বর পাত্রে। এটার নাম সেপারেটার পাত্র। সেপারেটার পাত্র থেকে ২-ক পাইপ বেয়ে জল নেমে আসে অ্যাবসরবার পাত্রে।

ওদিকে গরম অ্যামোনিয়া বাষ্প ২-ক পাইপ দিয়ে উঁচুতে উঠে শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঢোকে ৩ নম্বর লেখা কন্‌ডেন্সার পাত্রে। এই কন্‌ডেন্সার পাত্রকে ঘিরে থাকে ঠাণ্ডা জলের পাইপ। সারাক্ষণ এই পাইপগুলো দিয়ে সাধারণ তাপমাত্রায় জল পাঠানো হয়। ফলে গরম অ্যামোনিয়া বাষ্প কন্‌ডেন্সারে ঠাণ্ডা হয়ে তরল অ্যামোনিয়া হয়ে যায়।

এবার এই তরল অ্যামোনিয়া নেমে আসে ৪ নম্বর পাত্রে। এই

পাত্রের নাম ইভাপোরেটার। অ্যামোনিয়া ইভাপোরেটার ঢোকার আগেই ৬-ক পাইপ দিয়ে উঠে আসে হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাসকে সঙ্গী পেয়ে তরল অ্যামোনিয়া অল্প চাপে খুব সহজেই আবার বাষ্প হয়ে যায় ইভাপোরেটারের মধ্যে। আগেই বলা হয়েছে তরল অ্যামোনিয়া বাষ্প হবার সময়ে আশপাশ থেকে তাপ টেনে নেয়। ফলে ইভাপোরেটার যন্ত্রটার চার ধার হয়ে যায় খুব ঠাণ্ডা। তার মানে রেফ্রিজারেশান বা শীতলতা পাওয়া যায় এই ইভাপোরেটারের কাছ থেকেই। যা কিছু ঠাণ্ডা করার এখানেই রাখতে হয়।

ইভাপোরেটার পাত্র (৪নং) থেকে ৪-ক পাইপ দিয়ে নেমে আসে অ্যামোনিয়া বাষ্প ও হাইড্রোজেন গ্যাস। কিন্তু অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেনের চেয়ে ভারী। তাই অ্যামোনিয়া একেবারে নীচে নেমে ৫নং পাত্রে আবার জলের সঙ্গে মিশে যায়। হাইড্রোজেনের সঙ্গে আবার জলের আড়ি। হাইড্রোজেন জলের সঙ্গে মেশেনা। হাল্কা হাইড্রোজেন আবার গিয়ে ঢোকে অ্যাব্‌সরবারে। তারপর অ্যাবসরবার থেকে ফের ৬-ক পাইপ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করে। অ্যামোনিয়া বাষ্প হাইড্রোজেনের সঙ্গে অ্যাবসরবারে যায় কিন্তু ২-ক পাইপ থেকে নেমে আসা জল তাকে সঙ্গে করে টেনে নিয়ে যায় আবার ৫ নম্বর পাত্র হয়ে জেনারেটারে। তারপর আবার শুরু হয় প্রথম থেকে জল, অ্যামোনিয়া আর হাইড্রোজেনের খেলা। ২-ক পাইপের ঠিক তলায় অ্যাবসরবার পাত্রটাকেও কিন্তু বাইরে থেকে ঠাণ্ডা করে রাখতে হয় জল সরবরাহ করে। কারণ জল আর অ্যামোনিয়া মেশার সময় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়।

ঠাণ্ডা-মেশিন রেফ্রিজারেটারের কলকব্জার কথা শেষ করতেই সৌতি প্রশ্ন করল, "আচ্ছা শীতকালে বাড়ি গরম করার জন্য কিছু করেছেন আপনারা?"

"নিশ্চয়। রেফ্রিজারেটার কিভাবে চলে সেটা যদি বুঝে থাকো তবে এটা বুঝতেও কোন অসুবিধে হবে না।" কিরণদা বোঝাতে থাকেন। "ঠাণ্ডা করার মেশিন চলে বিজ্ঞানের একটা নিয়মকে ধরে। সেই নিয়মটা হচ্ছে, যে-কোন তরলকে বাষ্প করতে তাপ লাগে। এই কথাটাই অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যে-কোন তরল বাষ্প হবার সময় আশপাশ থেকে তাপ শুষে নেয়। বর্ষাকালের আগে কলেরার ইঞ্জেকশান নিয়েছ কখনো? ডাক্তার বাবু ছুঁচ ফোটানোর আগে তুলো দিয়ে হাতটা পরিষ্কার করে দেন তো? তুলোটা কিসে ভেজানো হয় বলতো?"

"রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট।" সুদেষ্ণার উত্তর।

"ঠিক বলেছে। আচ্ছা, তখন হাতের ওই জায়গাটা হঠাৎ কিরকম ঠাণ্ডা হয়ে যায় না?"

"ছ্যাক ছ্যাক করে।"

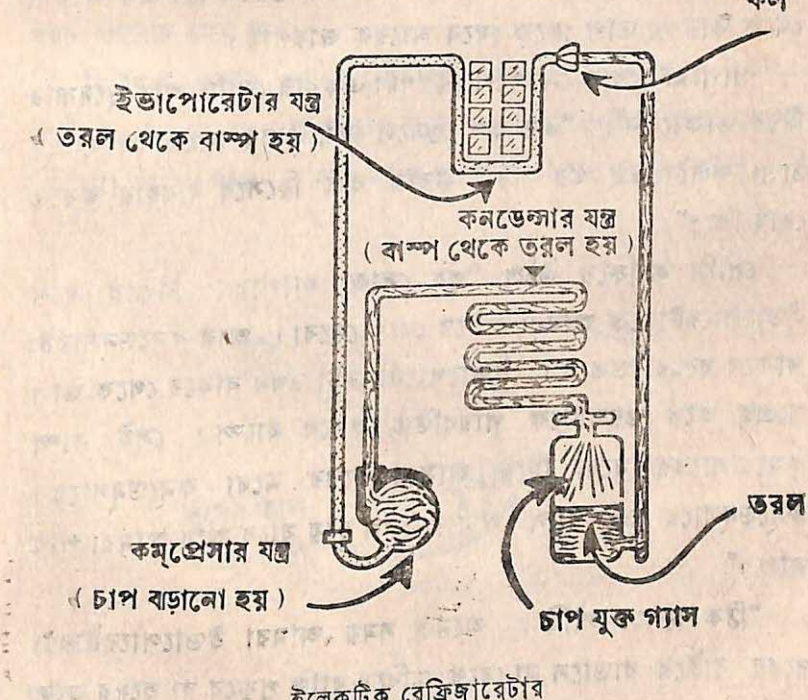
"কেন করে জানো? ওই স্পিরিটটা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। আর এই বাষ্প হবার জন্যে তোমার হাতের থেকে খানিকটা তাপ টেনে নেয়। ফলে হাতটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।"

"তাহলে হাতে জল লাগালে অত ঠাণ্ডা লাগেনা কেন?"—সৌতির প্রশ্ন।

"এক একটা তরল এক এক রকম উষ্ণতায় ও চাপে বাষ্প হয়। জলের চেয়ে অনেক অল্প তাপে স্পিরিট বাষ্প হয়। সাধারণ অবস্থায় জল অত তাড়াতাড়ি বাষ্প হয় না। তবে হাতে জল লাগিয়ে যদি ফু দাও তাহলে দেখবে হাতটা বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। তার

কারণ ফুঁ দেওয়ায় জল তাড়াতাড়ি বাষ্প হবার সুযোগ পেয়েছে। ইলেক্‌ট্রিক রেফ্রিজারেটারেও ঠিক এই রকম কাণ্ডই ঘটানো হয়। খুব সহজে বাষ্প করে ফেলা যায় এরকম একটা তরল (যেমন অ্যামোনিয়া বা ফ্রিয়ন) সেখানে ব্যবহার করা হয়। এর আগে তোমাদের তাপ-শোষণ পদ্ধতিতে ঠাণ্ডা করার মেশিনের কথা বলেছি। এবার শোনো আরেক রকম মেশিনের কথা। এখানে আর আগের মতো হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হবে না। তার বদলে থাকবে একটা কম্‌প্রেসার যন্ত্র। এই যন্ত্রটার কাজ হল একটা বদ্ধ পাত্রের মধ্যে চাপ বাড়ানো। একটা বাষ্পর উষ্ণতা না কমিয়েও যদি তাকে তরল করতে হয় তাহলে তার ওপর চাপ বাড়াতে হয়। কম্‌প্রেসার যন্ত্রটা এখানে সেই কাজই করে।"

কিরণদা আবার কাগজ পেন্সিল নিয়ে খসখস করে এঁকে ফেললেন আরেকটা ছবি।



ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেটার

এখানেও সেই ইভাপোরেটার যন্ত্র রয়েছে। যা-কিছু ঠাণ্ডা হবার এখানেই হয়। সহজে বাষ্প হয়ে যায় এমন একটা তরল ইভাপোরেটারের পাইপের কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আশপাশ থেকে টেনে নেয় তাপ এবং তরলের রূপ ছেড়ে বাষ্পের রূপ ধরে। ইভাপোরেটার থেকে বেরিয়ে বাষ্পটা পাইপ দিয়ে গিয়ে ঢোকে কম্প্রেসারে। কম্প্রেসার যন্ত্রটা চালায় ইলেক্ট্রিক মটর। কম্প্রেসারের ভেতরে চাপে পড়ে বাষ্পটা হয়ে যায় আবার তরল। এই তরল তারপর এসে ঢোকে কন্ডেন্সারে। কন্ডেন্সারে থাকে সরু সরু নলের হিজিবিজি কুণ্ডলী। তরলটা ইভাপোরেটার আর কম্প্রেসার থেকে যে তাপ সংগ্রহ করেছিল সেটা এবার এই নলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে যাবার পথেই ত্যাগ করে দেয়। তারপর আবার আগের মতো প্রথম থেকে শুরু হয় তার যাত্রা। এইভাবেই চলতে থাকে। একবার তাপ শুষে নেবে এক জায়গা থেকে তারপর তাপ ছেড়ে দেবে আরেক জায়গায়।

ব্যাপারটা বোঝানো হলে কিরণদা একবার সৌতি আর সুদেষ্ণার দিকে তাকালেন। "এত কথা শুনলে তো, এবার বলতো দেখি, এই ঠাণ্ডা কলটাকেই ঘর গরম করার কল হিসেবে ব্যবহার করতে দোষ কি ?"

সৌতি লাফিয়ে উঠল, "খুব সোজা ব্যাপার। ঠাণ্ডার দেশে ইভাপোরেটারকে আমরা বাইরে রেখে দেবো। আর কন্ডেন্সারটা থাকবে ঘরের ভেতরে। ইভাপোরেটারটা তখন বাইরে থেকে তাপ সংগ্রহ করে তরলটাকে পরিবর্তিত করবে বাষ্পে। সেই বাষ্প কম্প্রেসারের মধ্যে দিয়ে আসবে ঘরের মধ্যে কন্ডেন্সারে। কন্ডেন্সারে ওই বাষ্প আবার তরল হয়ে যাবে আর আমরা পাব তাপ।"

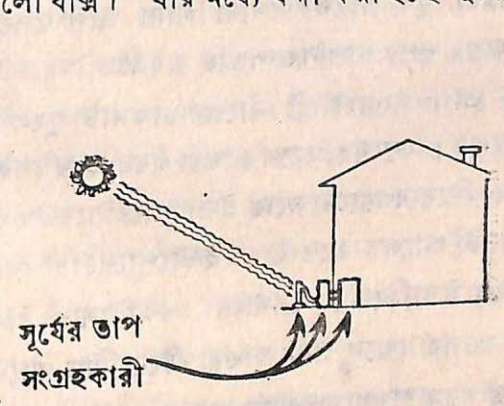
"ঠিক বলেছ সৌতি। অনেক সময় আমরা ইভাপোরেটারটা ঘরের বাইরে বাতাসে না রেখে, ডুবিয়ে রাখি পুকুরে বা হ্রদের জলে

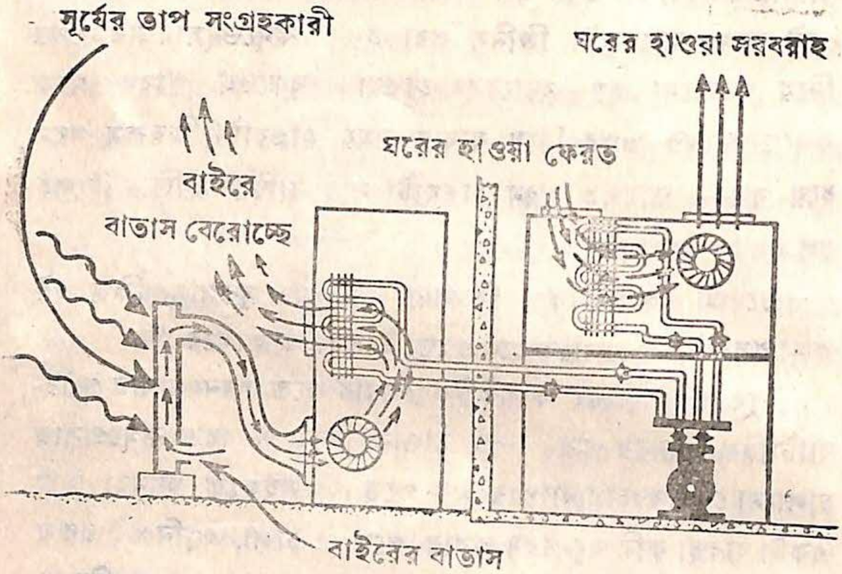
বা মাটির মধ্যে। তখন জল বা মাটি থেকে টেনে নেওয়া হয় তাপ। সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস করা হয়। কন্‌ডেন্‌সারটার ওপর দিয়ে বওয়ানো হয় ফ্যানের হাওয়া। বুঝতেই পারছ, গরম কন্‌ডেন্‌সারের ওপর দিয়ে যাবার সময় হাওয়াটা কিরকম গরম হয়ে যায়। তারপর গরম হাওয়াটা সারা বাড়িতে ছড়িয়ে দিলেই হল। কি বলো?"

সুদেষ্ণা বলল, 'কিন্তু কিরণদা, সব তো বুঝলাম, কিন্তু ওই কম্‌প্রেসারটাকে চালাতে হলেও তো ইলেক্‌ট্রিক লাগবে।"

"খুব সত্যি। ওই ইলেক্‌ট্রিক পাবার জন্যে তখন আবার সৌর-ব্যাটারির দরকার হয়। খুব ঠাণ্ডার দিনে অনবরত কম্‌প্রেসার চালানো বেশ খরচার ব্যাপার হয়ে পড়ে। সেইজন্যে আমরা অন্য একটা ব্যবস্থা করি ঘর গরম করার জন্যে। চলো, এখুনি ওই রকম একটা বাড়ি দেখাবো তোমাদের। এই ব্যবস্থায় ইলেক্‌ট্রিকের খরচা অনেক কমে যায়।"

কিরণদা ওদের একটা দোচালা বাড়ির কাছে নিয়ে এলেন। বাড়ির এক ধারের দেওয়ালে সেই আগের মতোই কাঁচের ঢাকনা পরানো কালো বাক্স। যার মধ্যে বন্দী করা হচ্ছে সূর্যের তাপ।





কিরণদা বললেন, "ওই ত্যাখো, সূর্যের তাপ সংগ্রহকারী ওই বাক্সের মধ্যেই ভরে রাখা হয়েছে ইভাপোরেটারটাকে। ফলে ইভাপোরেটারটা খুব সহজেই গাদা গাদা তাপ পেয়ে যাচ্ছে। কম্প্রেসার যন্ত্রের ওপর চাপটাও পড়ছে কম।"

কিরণদা তাপ সংগ্রহকারী বাক্সের ঢাকনাটা তুলে ভেতরে কি ঘটছে দেখালেন। সূর্যের তাপে হাওয়া গরম করে সেই হাওয়াকে একটা ফ্যান দিয়ে বওয়ানো হচ্ছে ইভাপোরেটারের ওপর। তার পরের ব্যাপারটা আগের মতোই। ইভাপোরেটার থেকে পাইপ এসে ঢুকেছে বাড়িতে। সেখানে কম্প্রেসার চলছে আর কণ্ডেন্সারের ওপর থেকে গরম হাওয়া টেনে নিয়ে আরেকটা পাখা সারা বাড়িতে গরম হাওয়া সরবরাহ করছে।

ইলেক্‌ট্রিক খরচ করে বাড়ি গরম করার ব্যাপারটা সুদেষ্ণার ভাল লাগল না। "আপনারা এতসব কাণ্ড করে ফেলেছেন, আর শুধু রোদ্দুর দিয়ে বাড়ি গরম করতে পারছেন না। মানে, বিদ্যুৎকে এক্কেবারে ছুটি দিয়ে?"

কিরণদা হাসেন। "নিশ্চয়—সে ব্যবস্থাও হয়েছে বৈকি।"

সুদেষ্ণা বলে, "আমাদের দেশেও তো শীতের দিনে রোদ্দুরে বালতি রেখে জল গরম করা হয়। সেরকম একটা ব্যবস্থা করলেই তো হত।"

"কথাটা তুমি খারাপ বলোনি। একটা বাড়ির মধ্যে যত সূর্যের আলো ঢোকার পথ করা যাবে ততই সেটা গরম হবে। আর সবচেয়ে ভাল হচ্ছে যদি জানলায় জানলায় কাঁচ লাগানো হয়। তাহলে রোদ্দুর বাবাজী ঘরে ঢুকে ভেতরের জিনিসপত্রে ধাক্কা খাবে, আলোকশক্তি পরিবর্তিত হবে তাপশক্তিতে কিন্তু ছিট্‌কে বেরোতে পারবেনা ততটা। সত্যি বলতে কি ঠিক এইভাবেই ঠাণ্ডার দেশগুলোতে এখন এমন সব বাড়ি তৈরি হচ্ছে যাদের পুরো দক্ষিণ-দিকটা জুড়ে থাকে বিরাট কাঁচের জানলা। আর বাড়ির ঘরগুলো থাকে লম্বা এক সারি বরাবর যাতে প্রত্যেকটা ঘরের একটা করে দেওয়াল অন্তত দক্ষিণ দিকে পড়ে। তাছাড়া দক্ষিণের জানলায় দু'জোড়া করে কাঁচ থাকে। আর এই দু'জোড়া কাঁচের মধ্যে বন্দী থাকে হাওয়া। এই বন্দী হাওয়া সূর্যের আলোকে ঢুকতে বাধা দেয়না কিন্তু অপরিবাহী হিসেবে ভেতরের তাপকে বাইরে বেরোতে বাধা দেয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার অনেকগুলো অসুবিধাও আছে। গরমের দিনে অতবড় জানলা থাকায় বাড়ি তেতে একেবারে আগুন

হয়ে যাবে। তাছাড়া বাতাস খেলার জন্যেও ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেইজন্যে খড়খড়ির মতো পাতলা ধাতুর একরকম পরদাও লাগাতে হয় অনেক সময়। ইচ্ছে মতো এগুলোকে খোলাবন্ধ করা যায় যাতে বাড়তি তাপ বের করে দেওয়া যায় ও তাজা বাতাস ঢোকানো যায়। কিন্তু সব সমস্যার চেয়ে বড় সমস্যা হল রাত্তির বেলার সমস্যা। মেঘলা দিনের সমস্যা। যে জিনিস যত তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে সেটাই আবার তত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডাও হয়। কাজেই সকাল বেলায় চটপট তেতে ওঠার জন্য যা-যা ব্যবস্থা করা হবে রাত্তির বেলায় সেই ব্যবস্থাই আবার হাঙ্গামা বাধাবে চটপট ঠাণ্ডা করে দিয়ে।”

সৌতি মাথা চুলকোতে লাগল। “ঠিক বুঝতে পারছিনা কিরণদা।”

“বুঝলে না? আচ্ছা শোনো তাহলে। একটা কালো রঙ করা টিন জল ভর্তি করে রোদ্দুরে রাখো। এবারে একই রকম আরেকটা সাদা টিনে জল ভর্তি করেও রোদ্দুরে রাখো। তারপর আধঘণ্টা পরে ছ্যাখো কোন্‌টা বেশী গরম হয়েছে।”

“কালোটাই হবে। সে তো আমরা জানি।” সুদেষ্ণা বলল।

“বেশ। এবার একটা উল্টো পরীক্ষা করো। একটা হাঁড়িতে করে জল ফোটাও। তারপর জলটা ঠিক দু’ভাগ করে কালো আর সাদা টিনে ঢেলে ছায়ায় রাখো। কিছুক্ষণ পরে যদি উষ্ণতা পরীক্ষা করো তাহলে কি দেখবে জানো? দেখবে, কালো টিনের জলটা বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এবার বুঝেছ তো? ঠিক একই কারণে যে কাঁচের জানলা দিয়ে দিনের বেলা অমন সুন্দর ভাবে ভেতরে তাপ ঢোকানো যায়, সেই কাঁচের জানলাই আবার রাত্তিরে সব তাপ ঝটপট বাইরে বের করে দিতে ওস্তাদ।”

“তাহলে উপায়?”

‘উপায় একটা আছে। সেটা হল তাপ সংগ্রহ করে রাখা।

দিনের বেলা যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশী তাপ পাওয়া যায়, তখন তার থেকে কিছুটা তাপ সরিয়ে রাখা যাতে প্রয়োজনের সময় সেটা ব্যবহার করা যায়। মানে একটা ভাঁড়ার ঘর তৈরি করা। যেখানে তাপ জমা থাকবে। কিন্তু ব্যাপারটা বলা যত সোজা কাজটা ততটা নয়। গরমকালে কৌটো ভরে রোদ রেখে দেবে আর শীতকালে আলমারি থেকে কৌটো বার করে ঢাকা খুললেই তাপ বেরিয়ে পড়বে, খুবই মুস্কিল। তবে গরমকালে সংগ্রহ করে শীতকালে সেই তাপ ব্যবহার করাটা সম্ভব না হলেও দিনের বেলা সংগ্রহ করে রেখে রাত্তিরে সেই তাপ ব্যবহার করা সম্ভব। সেই পদ্ধতি এখন চালু হয়েছে।"

"সত্যি?"

"খুব সত্যি। এই কাজে আমরা জলের সাহায্য নিই। জল একটা অদ্ভুত জিনিস। এর অনেক মজার গুণ আছে। তার মধ্যে একটা হল খুব বেশী আপেক্ষিক উষ্ণতা। আপেক্ষিক উষ্ণতার ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ধরো, আমরা সমান ওজনের জল, অ্যালকহল আর পারা নিলাম একই উষ্ণতায়। এবার ধরো আমাদের বলা হল এদের উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রি বাড়াতে হবে। কিন্তু এদের একটা উনুনের ওপর রাখলে দেখা যাবে পারার উষ্ণতা একশো ডিগ্রি বাড়াতে যদি তিন মিনিট সময় লাগে তাহলে অ্যালকহলের উষ্ণতা অতটা বাড়াতে ৫৮ মিনিট লাগবে আর জলের উষ্ণতা বাড়াতে লাগবে ১০০ মিনিট। এই ব্যাপারটাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, পারার আপেক্ষিক উষ্ণতা জলের চেয়ে বেশী আর জলের আপেক্ষিক উষ্ণতা বেশী অ্যালকহলের চেয়ে। তার মানে অ্যালকহলের তুলনায় জল অনেক বেশী তাপ জমা করে রাখতে পারে। সেইজন্যেই তাপ ছাড়তেও পারে অনেক বেশী। সৌর বিজ্ঞানীরা তাই ভেবে দেখলেন দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় এক টিন জলকে যদি গরম করে রাখা যায় তাহলে রাত্তিরে সেই গরম জল থেকে

তাপ পাওয়া যেতে পারে। তবে গরম জলের ট্যাঙ্কটাকে অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে এমন ভাবে ঢেকেঢুকে রাখতে হবে যাতে তাপ না বেরিয়ে যেতে পারে। এইসব কথা চিন্তা করে প্রথম যে রোদ্দুর বাড়িটা তৈরি করা হয়েছিল, তার ঢালু ছাতের ওপর দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসানো হয়েছিল জোড়া কাঁচের ঢাকা দেওয়া সেই চেপটা কালো বাক্স। কাঁচের তলায় কালো ধাতুর চাদরের সঙ্গে ঝালাই করা ছিল পাইপের কুণ্ডলী। এই পাইপের মধ্যে জল গরম হয়ে নেমে আসত বাড়ির নীচের তলায় একটা বিরাট ভাঁড়ার ঘরে। সেখানে বড় বড় জালার মধ্যে এমন ভাবে গরম জল রাখা হত যাতে একটুও না ঠাণ্ডা হতে পারে। শুধু কতকগুলো হাওয়া চলাচলের ফোকর দিয়ে গরম জল তাদের তাপ ছাড়ার সুযোগ পেত। এই ফোকরগুলো ইচ্ছে মতো খোলা বন্ধ করা যেত। ব্যবস্থাটা খারাপ নয়। এখনও অনেক বাড়িতে এই পদ্ধতি চালু আছে। কিন্তু মুস্কিলটা হচ্ছে এইভাবে বাড়ি গরম করতে হলে প্রচুর জায়গা লাগে।"

"তাহলে তো দেখা যাবে বাড়িতে আর লোক নেই শুধু জলের ট্যাঙ্ক আছে।" সৌতি হাসতে হাসতে বলল।

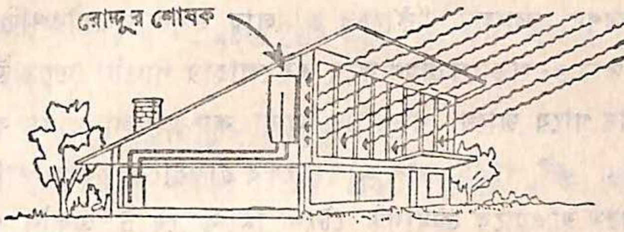
"ঠিক তাই। জল দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যেত না। শেষ পর্যন্ত রসায়নবিদরা একটা উপায় বার করলেন। শুরু হল জলের জায়গায় গ্লবার সল্ট নামে একটা নুনের ব্যবহার। আগে থেকেই জানা ছিল যে কিছু কিছু নুনকে গরম করলে তারা যখন গলতে শুরু করে তখন তাদের তাপমাত্রা বদলায় না। এই একই নুনগুলো যখন ঠাণ্ডা হয় তখন আবার তারা জমে যায়। এই সময় তারা তাদের মধ্যে জমা তাপ ছেড়ে দেয়।"

"গ্লবার সল্ট জিনিসটা কি?" সুদেষ্ণা প্রশ্ন করে।

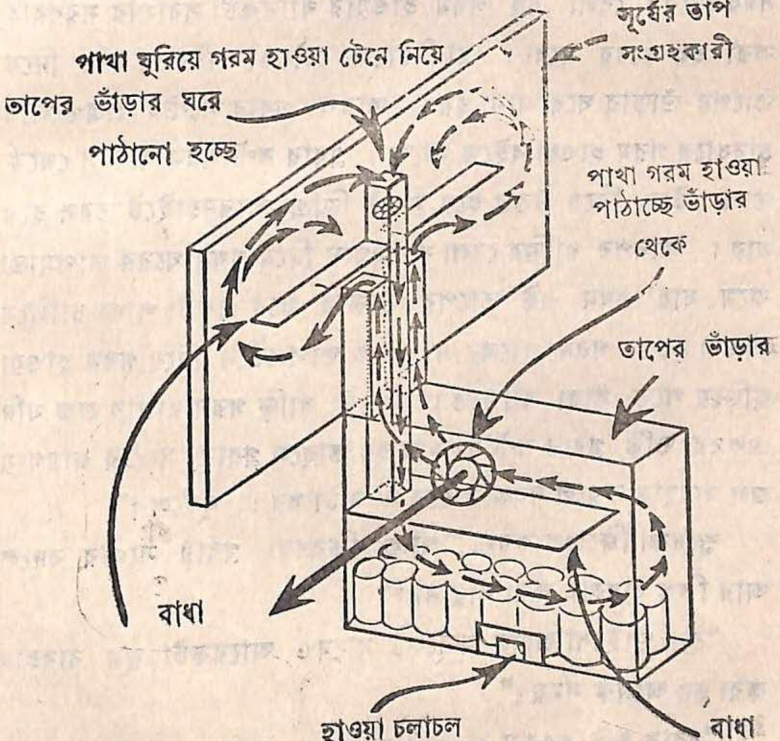
"এর রাসায়নিক ফর্মুলা হল হাইড্রেটেড সোডিয়াম সালফেট। এটা নব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইটে গলে। গলবার সময় এই নুনটা প্রচুর পরিমাণে তাপ টেনে নেয়। যতক্ষণ না নুনটা আবার জমছে

এই তাপ ছাড়া পায়না। চলো, তোমাদের একটা বাড়ি দেখিয়ে আনি। ওখানে গ্লবার সল্ট ব্যবহার করে তাপ জমা করে রাখা হয়।”

সৌতি আর সুদেষ্ণা কিরণদার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে হাজির হল। বাড়ির নীচের



বাড়ির বাইরের চেহারা



তাপসঞ্চয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা

তলাটাতেই শুধু লোকজন থাকে অবশ্য। ওপর তলার দক্ষিণ দিকের দেওয়াল জুড়ে শুধু জোড়া কাঁচের ঢাকনা। এই জোড়া কাঁচের পিছনে তিন ইঞ্চি মতো ছেড়ে ঘরের ভেতরে রয়েছে একটা ভুশো কালি মাখানো ধাতব প্লেট।

কিরণদা বললেন, "কাঁচের জানলার ওপর যে সৌরশক্তি এসে পড়ছে তার ৪০ শতাংশ গ্রহণ করে এই লোহার পাতটা তেতে উঠছে। পাতটার গায়ে ছ্যাখো খড়খড়ির মতো কতকগুলো বাধা বসানো হয়েছে। এই পাতটা তার আশপাশের হাওয়াকে তুলছে তাতিয়ে। সেই গরম হাওয়াকে ক্রমাগত টেনে নিচ্ছে ছোট্ট একটা পাখা। তখন আবার ঠাণ্ডা হাওয়া এসে নতুন করে তেতে উঠছে। শীতের সময় দিনের বেলা এই গরম হাওয়ার খানিকটা সরাসরি সরবরাহ করা হয় ঘরের মধ্যে। বাকীটাকে চৌকো পাইপের মধ্যে দিয়ে তাপের ভাঁড়ার ঘরে আনা হয়। তারপর গ্লবার সল্টের পাত্রগুলোর চারধারে গরম হাওয়া বইতে থাকে। গ্লবার সল্ট গরম বাতাস থেকে তাপ টেনে নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে নব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইটে তরল হয়ে যায়। তারপর রাত্তির বেলা বা মেঘলা দিনে যখন ঘরের তাপমাত্রা কমে যায় তখন এই তাপের ভাঁড়ার ঘরে একটা পাখা চালিয়ে দেওয়া হয়। গরম পাত্রের গা থেকে তাপ টেনে নিয়ে গরম হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে সারা বাড়িতে। একটা বাড়ি গরম রাখার জন্য যদি একঘর ভর্তি গ্লবার সল্ট দরকার হয় তাহলে গ্লবার সল্টের জায়গায় জল ব্যবহার করলে দরকার হবে ন' ন'টা ঘর। বুঝলে?"

সুদেষ্ণা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কিরণদা, গ্লবার সল্টের বদলে আর কিছু ব্যবহার করা যায় না?"

"হ্যাঁ, ডাইসোডিয়াম ফস্‌ফেট নামেও আরেকটা নুন ব্যবহার করা হয় অনেক সময়।"

"গ্লবার সল্ট এরকম বারবার তরল আর শক্ত হতে হতে খারাপ হয়ে যায় না?" সৌতি এবার প্রশ্ন করে।

"না, গ্রবার সল্ট বহুকাল ব্যবহার করা যায়। দশদিন ধরেও যদি গ্রবার সল্টকে তরল ও গরম অবস্থায় রাখা যায় তবু দেখা যাবে তার ধর্ম পাল্টাচ্ছেনা। প্রয়োজনের সময় তাপ ছেড়ে দিয়ে আবার জমাট হয়ে যাচ্ছে।"

তাপের ভাঁড়ার ঘরের রহস্য ভেদ করে তিনজনে আবার রাস্তায় এসে নামল।

"এবার আমরা কোথায় যাব কিরণদা ?"

"এই দু' একটা বাড়ির পরেই একটা মজার বাড়ি দেখাব, চলো—"

বাড়ির ছাতে শেওলার ক্ষেত

কিরণদার সঙ্গে বাড়িটার ছাতে উঠেই চমকে গেল দু'জনে। একী! সারাটা ছাত জুড়ে জল থইথই করছে। তার ওপর একটা স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের চাদর ঢাকা দেওয়া। ছাতের চৌবাচ্চার ভেতরে সবুজ সবুজ শেওলা জমে আছে প্রচুর।

কিরণদা বললেন, "দেখেছ? বাড়ির ছাতে কেমন চাষবাস হচ্ছে।"

"চাষবাস? এতো শেওলার মতো দেখাচ্ছে।" সুদেষ্ণা বলল।

"হ্যাঁ—শেওলাই তো চাষ করা হচ্ছে।"

"তার মানে? শেওলা দিয়ে কি হবে?" সৌতিও অবাক।

"বারে—আজকাল এই শেওলাই তো মানুষের প্রধান খাদ্য। না, না, আর প্রশ্ন নয়। আমিই সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। চলো, বাড়ির ভেতরে গিয়ে বরং বসা যাক। তারপর আবার দেখতে আসব।"

ঘরে ঢুকে কিরণদা একটা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন শেওলা চাষের গল্প শোনাতে।

"তোমরা আগেই দেখেছ, পাতার কারখানায় কিভাবে খাদ্য তৈরি হয়। পৃথিবীতে গাছই কেবল অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ তৈরি করতে পারে। কাজেই জীবজগত এ ব্যাপারে পুরোপুরি গাছের ওপর নির্ভরশীল। তোমরা জানো গাছের পাতায় আলোক-সংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি হয়। বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল টেনে নেয় গাছের পাতা। তারপর সূর্যের আলো ও ক্লোরোফিলের সাহায্যে তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট ও অক্সিজেন। ক্লোরোফিল এই শব্দটা এসেছে গ্রীক্ ভাষা থেকে। ক্লোরো মানে সবুজ আর ফিল্ মানে পাতা। তার মানে ক্লোরোফিলই

সেই জিনিস যার জন্যে গাছের পাতার রঙ হয় সবুজ। আসলে ক্লোরোফিল হচ্ছে একটা জটিল রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ, যার মধ্যে আছে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ও ম্যাগনেসিয়াম। ক্লোরোফিল নিজে কিন্তু পাতার মধ্যে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না। শুধু তার উপস্থিতিটাই প্রয়োজন হয়। ওদিকে সৌর-শক্তির (আলোর) প্রয়োজন হয় জলটাকে ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরি করতে। আলো ও ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে এই হাইড্রোজেন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে কার্বোহাইড্রেট। শুধু



তাই নয়, এই কার্বোহাইড্রেট থেকেই গাছ আবার আরো নানা রকম রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে, যেমন—ফ্যাট্ (চর্বি) ও প্রোটিন ইত্যাদি। আমরা যা কিছু খাই তার প্রধান উপাদান হচ্ছে এই কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন। এক এক ধরনের খাদ্যে এই উপাদানগুলোর পরিমাণ থাকে এক এক রকম। তাছাড়া প্রোটিনের মধ্যে সামান্য পরিমাণ ফসফরাস, গন্ধক ও নাইট্রোজেন ইত্যাদিও থাকে। এ সবই আমাদের পুষ্টির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। আলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় আলোটুকু বা শক্তিটুকু সরবরাহ করে সূর্য। কাজেই সূর্যের শক্তিকে যদি

আরো বেশী করে কাজে লাগাতে হয় তাহলে আরো বেশী করে চাষবাস করতে হবে, গাছগাছড়া লাগাতে হবে। আর নয়তো এমন সব গাছ লাগাতে হবে বা নতুন গাছ তৈরি করতে হবে যা চড়চড় করে বেড়ে উঠবে, আরো বেশী মাত্রায় সৌর-শক্তিকে গ্রহণ করবে। একমাত্র গাছপালারাই সূর্যের আলোর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য তৈরি করে ঠিক কথা, কিন্তু কাজটা তারা খুব ভালভাবে করে না। সূর্যের আলোকে তারা হেলায় ফেলায় নষ্ট করে। পৃথিবী প্রতি বছর যে সৌরশক্তি লাভ করে তা পেতে হলে আমাদের ১২০,০০০ বিলিয়ান টন কয়লা পোড়াতে হয়। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র তিরিশ শতাংশ শক্তি পাওয়া যায় আলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য। বাকীটা উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ও সমুদ্রের ওপরে গিয়ে পড়ে। এই তিরিশ শতাংশ শক্তিও কিন্তু কম নয়—৩৬,০০০ বিলিয়ন টন কয়লা পোড়ানোর সমান। এই যে শক্তিটা পাওয়া যায় এর মধ্যে ২০ শতাংশ আবার আলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার পক্ষে উপযোগী নয়। এইসব হিসেব করার পর দেখা যাবে গাছেরা খাদ্য তৈরির জন্য সূর্যের কাছ থেকে প্রতি বছর যে শক্তি পায় সেটা হচ্ছে ২৮,০০০ বিলিয়ন টন কয়লা পুড়িয়ে পাওয়া শক্তির সমান। একটু আগেই বলছিলাম না গাছেরা সূর্যের আলোকে হেলায়-ফেলায় নষ্ট করে। এবার বুঝতে পারবে কথাটা। এই যে বিরাট শক্তি তারা পাচ্ছে তার মাত্র একশো ভাগের এক ভাগও তারা পুরোপুরি ব্যবহার করে না—বাকীটা স্রেফ নষ্ট। কাজেই কোন রকম ভাবে গাছেদের আলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার যদি উন্নতি করা যায় তাহলে কি সাংঘাতিক ব্যাপার হবে ভাবতে পারো? একই গাছের হয়তো ছু' গুণ তিন গুণ ফলন হবে। ঠিক এই চিন্তা মাথায় নিয়েই বিজ্ঞানীরা প্রথম গবেষণা শুরু করেন। তাঁরা দেখেন ক্ষেতে সাধারণত যেসব চাষ করা হয় সেখানে আলোক-সংশ্লেষের জন্য উপযোগী সৌর-শক্তির ছুশো ভাগের এক ভাগ মাত্র কাজে লাগে। বিজ্ঞানীরা তখন চিন্তা করতে আরম্ভ করেন কি ধরনের

চাষ করলে আরো বেশী করে সৌর-শক্তিকে ব্যবহার করা যাবে। কারণ এটাও দেখা গেছে যে কিছু কিছু গাছ অন্যদের তুলনায় অনেক দ্রুত হারে আলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া চালাতে পারে। কিন্তু একটা গাছ শুধু চড়চড় করে মাথায় ঢ্যাঙা আর গায়ে-গতরে মোটা হয়ে উঠলেই তো আর আমাদের কাজে লাগবে না। তার কাছ থেকে আমরা কি পাচ্ছি দেখতে হবে। এখানে আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার। গাছের পাতায় আলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ঠিক উল্টো আরেকটা প্রক্রিয়া ঘটে। এটাকে বলে গাছের রেস্‌পিরেশান বা নিঃশ্বসন। আলোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় গাছ যে খাদ্য তৈরি করে জমায় সেইটাই আবার সে নিঃশ্বসন প্রক্রিয়ায় খেতে শুরু করে। গাছ তখন পাতা দিয়ে বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নেয় এবং সঞ্চিত খাদ্যের সঙ্গে এই অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও শক্তি। এই শক্তিকে ব্যবহার করেই গাছেরা বেড়ে ওঠে। তবে সব শক্তিটুকুই গাছের বেড়ে ওঠার কাজে শেষ হয়ে যায় না। তার কিছুটা আবার জমা থাকে গাছের দেহে। সেইজন্যেই কাঠ পুড়িয়ে আমরা তাপশক্তি পাই। সূর্যের আলো, হাওয়া আর জল থেকে এই ধরনের যেসব গাছ তাড়াতাড়ি খাদ্য ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে তার খুবই প্রয়োজন আছে জ্বালানী হিসাবে। কিন্তু প্রয়োজনটা যেখানে খাদ্যের সেখানে আমরা এমন গাছ চাই না যার শরীরের অর্ধেকটাই শুধু অখাদ্য ডালপালা শেকড়-বাকড়। এই এত কথা বলা শুধু এইটুকু বোঝানোর জন্যেই যে, সব দিক বিচার করে শেওলাই (algae) খাদ্য হিসেবে সবচেয়ে উপযোগী। শেওলা বাড়েও চটপট আর তার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অংশ নেই বললেই চলে। সবটুকুই কাজে লেগে যায়। শেওলার চাষ কিভাবে হচ্ছে দেখাবার আগে শেওলা সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া খুবই দরকার। আদিকাল থেকেই শেওলাদের দেখা গেছে। পুকুর কি ডোবা কি সমুদ্র, জলা জায়গা পেলেই শেওলা জন্মায়। এদের

না আছে সত্যিকার শেকড় কি ডাল, পাতা বা ফুল। তবে ক্লোরোফিল আছে ঠিকই। সব শেওলাই যে সবুজ দেখতে হয় এমন কোন কথা নেই। নীলচে-সবুজ, চকচকে খয়েরি বা লাল— বহু ধরনের শেওলা হয়। সত্যি বলতে, এ পর্যন্ত শেওলার ৩০,০০০ প্রজাতির (species) সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কোনটা জলে ভেসে থাকে, কোনটা থাকে জলের নীচে, কোনটা জলচর প্রাণীর মতো ভেসে বেড়ায়, আবার কোনটা জন্মায় গাছের গুঁড়িতে বা পাহাড়ের ফাঁকে ফোকরে, স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালে। কিছু শেওলা আকারে এতই ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাই যায় না। আবার এমন সামুদ্রিক শেওলাও আছে (আগাছা বলে অনেক সময়) যা লম্বায় একশো ফুটেরও বেশী। তবে সব শেওলারই বৈশিষ্ট হল এদের পুরোটাই শুধু খাদ্য। শেকড়-বাকড়, বাকল, ডালপালা ইত্যাদি বড় বড় গাছের অনুষঙ্গের কোন বালাই নেই তাদের। ফলে তুলনামূলক-ভাবে পরিমাণে অতি সামান্য শেওলার কাছ থেকে আমরা প্রচুর খাদ্য পেতে পারি। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গেছে 'ক্লোরেল্লা পাইরেনোইডোসা' নামে একটি শেওলাই খাদ্য হিসেবে সবচেয়ে ভাল। মাত্র এক একর জমিতে চল্লিশ টন ক্লোরেল্লা ফলানো যায়। তার মধ্যে কুড়ি টন শুধু প্রোটিন আর দু' টন ফ্যাট (চর্বি)। চালু ফল-মূল বা শস্যের মধ্যে এত বেশী পরিমাণ প্রোটিন বা চর্বি পাওয়া যায় না। সোয়াবিনে খুব প্রোটিন আছে সবাই জানে। কিন্তু ক্লোরেল্লার কাছে সেটা কিচ্ছু নয়। দু'টো সমান আকারের ক্ষেত নিয়ে একটায় সোয়াবিন আর আরেকটায় ক্লোরেল্লার চাষ করলে দেখা যাবে ক্লোরেল্লা সোয়াবিনের চেয়ে দু'শো গুণ বেশী প্রোটিন দিচ্ছে। একজন মানুষের যদি দিনে ৬৫ গ্রাম করে প্রোটিন লাগে তাহলে মাত্র ১৫০০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে ক্লোরেল্লার চাষ করলে সারা পৃথিবীর মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন মেটানো যাবে।

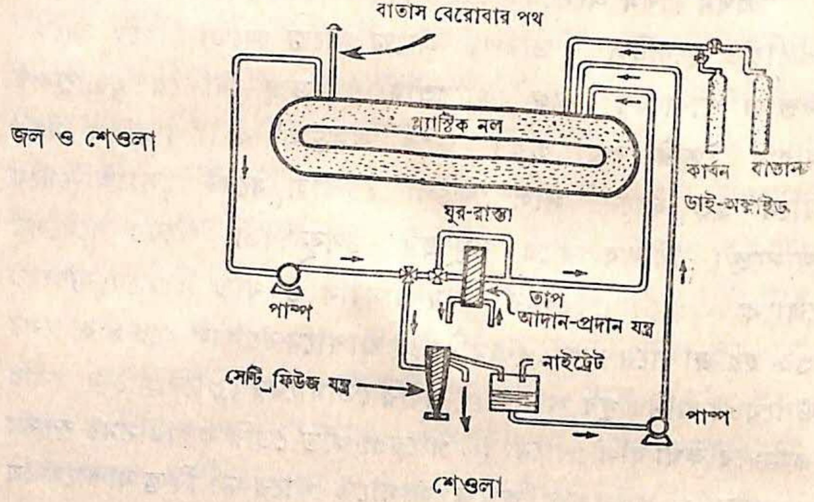
আর কোন উদ্ভিদ সূর্যের আলোকে এত ভালভাবে কাজে লাগাতে পারে না।”

একটানা বক্‌তে বক্‌তে কিরণদার গলা শুকিয়ে যাবার যোগাড়। কিন্তু থামবার কি কোন উপায় আছে। তাহলেই প্রশ্ন। সুদেষ্ণা জিজ্ঞেস করে বসল, “এই শেওলা খেতে ভাল লাগে?”

“প্রথম প্রথম অনেকেই খেতে চাইত না। সে তো সোয়াবিনের বেলায়ও হয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে গেছে। অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ক্লোরেল্লার পাউডার মিশিয়ে খুব সুন্দর খাবার তৈরি করা যায়। তবে ‘কনড্রাস’ বা ‘আইরিশ মশ’ নামে এক ধরনের লাল শেওলা বহুকাল ধরেই লোকে খেয়ে আসছে। বিশেষ করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অনেক দেশের লোকে। তবে শেওলার প্রথম চাষবাষ ও খাদ্য হিসেবে ব্যবহার শুরু হয় জাপানে। কারণ এমনিতেই জাপানে বহুকাল ধরে চাষবাষের উপযোগী জমির খুব অভাব। এবার তোমাদের ক্লোরেল্লা চাষ করার কায়দার কথা বলি শোনো। গাছেরা খাদ্য তৈরি করার সময় সূর্যের আলোর ১ শতাংশও কাজে লাগাতে পারে না কিন্তু বাতাসে যে সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে (·০৩ শতাংশ বা হাজার ভাগ বাতাসে তিন ভাগ) সেটাকে দিব্যি কাজে লাগায়। শুনলে অবাক হবে ১ টন কার্বোহাইড্রেট ফলাতে ১½ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড লাগে এবং তার জন্যে কৃষিক্ষেত্রের মাথায় ১৮০০ ফুট ওপরকার বাতাসের স্তর থেকেও গাছপালাকে কার্বন ডাই-অক্সাইড যোগাড় করে নিতে হয়। গাছের মতো ক্লোরেল্লারও ঠিক এমনি কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন হয়। ১ পাউণ্ড ক্লোরেল্লার জন্য ২ পাউণ্ড কার্বন ডাই-অক্সাইড আর ½ পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয়। ক্লোরেল্লা আবার জন্মায় জলের তলায়। কাজেই জল থেকেই তার কার্বন ডাই-অক্সাইড আর নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটাতে হয়। সাধারণ চাষবাসের মতো ফসল বোনা, রোয়া বা কীটপতঙ্গের হাত

থেকে রক্ষা করার ঝামেলাগুলো না থাকলেও ক্লোরেল্লা চাষের অন্য ঝামেলা আছে। বিজ্ঞানীরা প্রথম কিভাবে এইসব সমস্যার সমাধান করেন সেটা এবার বলছি।"

কিরণদা কথা থামিয়ে খসখস করে একটা ছবি এঁকে ফেললেন।



"ছবিতে ওই যে প্ল্যাস্টিকের নল দেখছ, ওটা একশো ষাট ফিট লম্বা, চার ফিট চওড়া আর কয়েক ইঞ্চি গভীর। স্বচ্ছ বলে ওর মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকতে পারে। ওটার মধ্যে আছে জল আর শেওলা। ছবির বাঁ দিকের পাম্পটা ওই জল আর শেওলাকে প্রয়োজন মতো টেনে বার করে আনে। সূর্যের আলোয় ক্লোরেল্লা সবচেয়ে ভাল বাড়ে ৮৬° ফারেনহাইট উষ্ণতায়। তাই কখনো যদি প্ল্যাস্টিকের নলের মধ্যে উষ্ণতা খুব বেড়ে যায় তাহলে বাড়তি তাপটুকুকে কমাবার ব্যবস্থা করতে হয়। এর জন্যে আছে তাপ আদান-প্রদান যন্ত্র। এই যন্ত্রের চারপাশ ঘিরে অনবরত সাধারণ তাপমাত্রায় জল সরবরাহ করা হয়। পাম্পের সাহায্যে ক্লোরেল্লা সমেত প্ল্যাস্টিক নলের উত্তপ্ত জল এর মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে

এনে ঠাণ্ডা করা হয়। এবার ছবির ডান ধারের মাথার দিকে তাকাও। ওখানে রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড আর বাতাস। ১০০ ভাগ বাতাসে ৫ ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড, এই হিসেবে ওখান থেকে বাতাস ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণ পাঠানো হয় প্ল্যাস্টিক নলে। তাছাড়া প্রয়োজন মতো নাইট্রেটও পাঠানো হয় নলের মধ্যে পাম্পের সাহায্যে। নাইট্রেট, বাতাস ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে বাড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের ক্লোরেল্লা পাওয়া যেতে পারে। যেমন প্রোটিনের মাত্রা ৭ থেকে ৮৮ শতাংশের মধ্যে রাখা যায়, কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা রাখা যায় ৬ থেকে ৩৮ শতাংশের মধ্যে এবং ফ্যাট বা চর্বির পরিমাণ ১ থেকে ৭৫ শতাংশের মধ্যে। ক্লোরেল্লার চাষ সম্পূর্ণ হলে জল ও ক্লোরেল্লাকে নিয়ে আসা হয় সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে। দুধ থেকে যেমন ক্ষীর তোলা হয় ঠিক তেমনিভাবে এই যন্ত্রে ক্লোরেল্লাকে স্বতন্ত্র করা হয় জল থেকে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রেট মেশানো জলটা আবার ফেরত যায় প্যাস্টিক নলে। শুধু ক্লোরেল্লা যেটুকু কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন গ্রহণ করেছে সেই ঘাটতিটুকু পূরণ করে দেওয়া হয়। এবার বুঝতে পারছ তো, ক্লোরেল্লা চাষের কত সুবিধা? এক ফোঁটা মাটির দরকার নেই, কাজেই মাটির ক্ষয়ক্ষতিরও ব্যাপার নেই। বৃষ্টি হল কি হল না তার জন্যেও চিন্তা নেই। মরুভূমির মধ্যেও ক্লোরেল্লার চাষ হয়। বিশেষ করে একই জল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করার জন্য চাষের কাজে খুব কম জল খরচ হয়। তাছাড়া প্ল্যাস্টিকের নলের মধ্যে থাকার জন্যে মরুভূমির গরমে জল যে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে সে উপায় নেই। কীটনাশক ব্যবহার করারও কোন প্রয়োজন পড়ে না। তাছাড়া জমি চাষ করার জন্য গরু, বলদ, ট্র্যাক্টার—এসব কোন আমেলার মধ্যে যেতে হয় না। সারা বছর ধরেই ক্লোরেল্লার চাষ হতে পারে। তাছাড়া যখন

যে রকম প্রয়োজন সেই অনুসারে ক্লোরেল্লা থেকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন বা চর্বি পাওয়া যেতে পারে।”

কিরণদা কথা থামালেন। একজন ভদ্রমহিলা হাতের ট্রে-তে করে খাবারের ডিশ এনে রাখলেন টেবিলের ওপর।

“এসব আবার কি বৌদি ?” কিরণদা বললেন।

“আপনার ছোট্ট বন্ধুদের ক্লোরেল্লার গল্প শোনাচ্ছেন দেখে চটপট স্যুপ তৈরি করে এনেছি। ওরা খেয়ে দেখুক, কেমন লাগে।”

কিরণদা বললেন, “বাঃ, তবে তো ভালই হল। একেবারে হাতেনাতে দেখা হয়ে যাবে। নাও-নাও—হাত চালাও। এরপর আবার ছাতের ক্লোরেল্লা ক্ষেত দেখতে যেতে হবে।”

সৌতি আর সুদেষ্ণা একটু কিন্তু-কিন্তু করে চামচে করে স্যুপ তুলে মুখে পুরল।

“বাঃ—এ যে চিকেন কর্ন স্যুপের মতো খেতে।” বলে উঠল সুদেষ্ণা।

“ঠিক বলেছিস।” সৌতি অনেকক্ষণ পরে বোনের সঙ্গে একমত হল।

“তাহলে তোমাদের ভাল লেগেছে বলো ?”

“আরেকটু নেবে ?” বৌদি জিজ্ঞেস করলেন।

সৌতি লজ্জা পেয়ে গেল। “না না!”

আপত্তি করলে কি হবে। আরো খানিকটা করে খেতে হল দু'জনকেই।

কিরণদা বললেন, “ক্লোরেল্লা চাষের অনেক সুবিধের কথা বলেছি কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধার কথাটা বলা হয়নি। সেটা হল, কার্বন ডাই-অক্সাইড যোগাড় করার সমস্যা। কার্বন ডাই-অক্সাইড যোগাড় করার অসুবিধার জন্যই পৃথিবী জুড়ে ক্লোরেল্লার চাষ শুরু হতে অনেক দেরী হয়েছে। এখন অবশ্য সেটা আর কোন সমস্যা নয়। এই যেমন ধরো এই বাড়িতেই এখন যত আজেবাজে পচা জিনিস কি মলমূত্র থেকেই সংগ্রহ করে ফেলা হচ্ছে কার্বন

ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন। তাছাড়া এমন অনেক কারখানা আছে যেখানে এতদিন রাসায়নিক কাজকর্মের পর কার্বন ডাই-অক্সাইড শুধু শুধু নষ্ট হত, শুধু তাই নয় চারপাশের আবহাওয়াও বিষাক্ত হত। চলো, এবার ছাতের ওপর উঠে ঘুরে দেখে আসা যাক।'



ছাতে উঠে এবার ভাল করে নজর করে দেখল সৌতি আর সুদেষ্ণা। সারাটা ছাত জুড়ে জল জমে রয়েছে চেপটা একটা চৌবাচ্চায়। আর তার মধ্যে জন্মেছে অজস্র সবুজ সবুজ শেওলা। ছাতের ডানদিকে একটা লম্বা পাইপের অনেকগুলো মুখ দিয়ে ঝির ঝির করে জল পড়ছে। কিরণদা বললেন, "ছাতের ডানদিকে ওই যে ডাণ্ডার মাথায় একটা সোলার সেল সুইচ দেখছো, ওটা এই চৌবাচ্চার জলের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। চড়চড়ে রোদ উঠলেই সুইচটা একটা মটর চালু করে দেয়। তখন ছাতের জল নীচে নেমে এসে তাপ আদান প্রদান যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ঘুরে আবার ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে যায় ছাতে।"

সুদেষ্ণা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল জলের ট্যাঙ্কের মাথায় যে ঢাকনাটা রয়েছে সেটা কাঁচের নয়, স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের।

ছাতের ওপর যা দেখার দেখে নিয়ে এবার সবাই নীচে নেমে এল।

প্রথমেই তাপ আদান-প্রদান যন্ত্রটা চোখে পড়ল। এখানে কতকগুলো পাইপের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাধারণ তাপ-মাত্রায় জল পাঠানো হচ্ছে আর সেই ঠাণ্ডা পাইপগুলো ডোবানো আছে বাঁ পাশে মণ্ড রাখার পাত্রে। এই মণ্ড রাখার পাত্রের তলায় শেওলা জমা হচ্ছে। আর ওপরে যে জলটা থাকছে সেটাকে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ছাতে। শেওলাগুলো থকথকে কাদার মতো চেহারা নেয় মণ্ড রাখার পাত্রে। তারপর ছাঁটাই কলে নিয়ে এসে সেগুলোকে শুক্‌নো করে গুঁড়োগুঁড়ো করে ফেলা হয়। শেওলা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য খনিজ সংগ্রহ করা হয় একবারে ডান ধারের সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কটাতে। এখানে মলমূত্র ও আবর্জনা থেকে বিশেষ রাসায়নিক উপায়ে এগুলোকে স্বতন্ত্র করা হয়।

সৌতি জিজ্ঞেস করল, "এই শেওলার চৌবাচ্চাটা পরিষ্কার করতে হয় না মাঝে মাঝে?"

"বলতে গেলে হয়ই না। শেওলারাই সব ময়লা খেয়ে ফেলে তাই ময়লা জমতে পারেনা। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা। ঠাণ্ডার দেশে আবার এই শেওলার ট্যাঙ্কের জল ঘর গরম করার কাজে লাগে।"

"কি করে?"

"দিনের বেলা যখনই জলের উষ্ণতা ৮৬ ডিগ্রি ফারেনহাইটের চেয়ে বেড়ে যায়, অমনি সেই গরম জলকে নীচে তাপের ভাঁড়ার ঘরে এনে গ্লবার সল্টের টিন গরম করা হয়। বাড়তি তাপটুকু গ্লবার সল্টকে দিয়ে ছাতের ট্যাঙ্কের উষ্ণতা সবসময় ৮৬ ডিগ্রিতে রাখা হয়। তারপর রাত্তির বেলা যখন বেশী ঠাণ্ডা লাগে ওই গ্লবার সল্ট তখন জমানো তাপ ছেড়ে ঘর গরম করতে শুরু করে। আগেই তো শুনেছ তোমরা সে-কথা।"

শেওলার চাষ দেখা শেষ হতে কিরণদা প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা সৌতি তোমাদের বাড়িতে কি রকম উনুনে রান্না হয়?”

“কয়লার উনুন আছে, কেরাসিনের স্টোভ আছে, ইলেকট্রিক হিটারও একটা আছে।” সৌতি জানাল।

সুদেষ্ণা বলল, “বাবা বলছিল যে একটা গ্যাসের উনুন কিনবে। তাতে নাকি অনেক ঝামেলা কম।”

সৌতি বলল, “আমি দেখেছি গ্রামের দিকে গরীব লোকেরা গাছের শুকনো ডালপালা দিয়ে রান্না করে। অনেকে ঘুঁটের আগুনও জ্বালে।”

কিরণদা বললেন, “ঠিক বলেছ সৌতি। তোমাদের দেশে ঘুটে জ্বালিয়ে বহু লোক রান্না করে। কিন্তু এর একটা খারাপ দিকও আছে।”

“কেন? তেল, কয়লার মতো মূল্যবান জিনিস তো বরং বেঁচেই যাচ্ছে। গোবর তো এমনিতেই ফেলা যায়।” সুদেষ্ণা বলল।

“না, সুদেষ্ণা। ভুল করছ তুমি। জমির সার হিসেবে গোবর অত্যন্ত মূল্যবান। এই সারকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। গোবর সার ঠিক মতো ব্যবহার করলে জমির ফলন দু'গুণ বেড়ে যেতে পারে।”

“কিন্তু গরীব লোকেরা তাহলে রাঁধবে কি করে?”

“কি করে রাঁধবে সেইটাই তো তোমাদের দেখাব এবার।” কিরণদার পিছনে পিছনে চলল সৌতি আর সুদেষ্ণা।

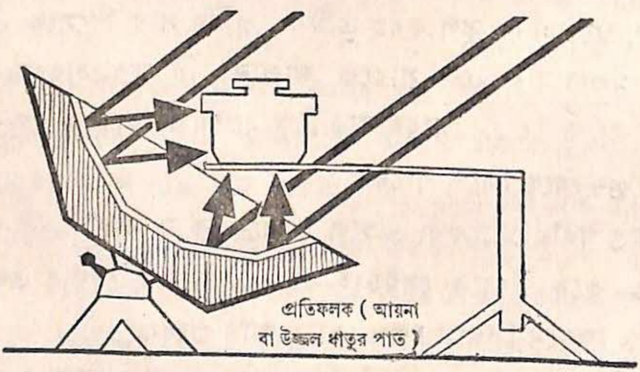
“বিনি পয়সার জ্বালানী দিয়ে সবচেয়ে কম ঝামেলায় রান্নার ব্যবস্থা এখন আমাদের ঘরে ঘরে চালু হয়ে গেছে।”

"বিনি পয়সার জ্বালানী ? তার মানে রোদ্দুর ? রোদ্দুর দিয়ে রান্না হয়, তাই না ?" সুদেষ্ণা বলে উঠল।

"ঠিক ধরেছ। রোদ্দুরের উনুনটা দেখাবার আগে তোমাদের একটা মজার কথা বলে নিই। এই খবরটা খুব কম লোকেই জানে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে উইলিয়াম অ্যাডাম্‌স্ নামে একজন ইংরেজই বোধহয় রোদ্দুরের উনুন দিয়ে প্রথম রান্না করেন। ১৮৭৮ সালের উনিশে জুন বিখ্যাত বিজ্ঞান-পত্রিকা 'সাইন্টিফিক আমেরিকান'-এ তিনি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও লেখেন। বোম্বাইয়ে যখন সবচেয়ে ঠাণ্ডা, সেই জানুয়ারি মাসে সাতজন সৈনিকের পুরো রান্না করতে মাত্র দু' ঘণ্টা সময় লেগেছিল অ্যাডাম্‌স্ সাহেবের। মাংস, তরিতরকারি—কোনটাই বাদ পড়েনি তার থেকে।"

"আশ্চর্য তো!" সৌতি বলে। "এমন একটা আবিষ্কার নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায়নি এতকাল।"

"না, তা অবশ্য ঠিক নয়। অ্যাডাম্‌স্ সাহেবের চেয়েও ভাল একটা রোদ্দুরের উনুন তৈরি করেছেন জামসেদপুরের মণি ঘোষ। শুধু তাই নয় তাঁর উনুনটা তৈরি করাও খুব সোজা। মণিবাবুর কথা পরে বলছি। আগে চলো, আমাদের রোদ্দুরের উনুনটা দেখাই।"



রোদ্দুরের উনুন—১

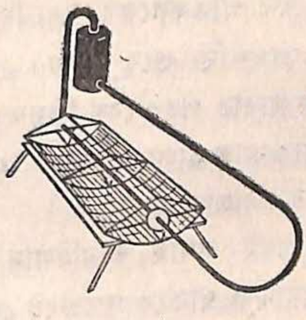
অবতল (কন্‌কেভ) রোদ্দুরের উনুনে কেট্‌লির জল গরম হচ্ছে

বাড়ির সামনের উঠোনে এসেই ওরা দেখল তিন ঠ্যাঙে ভর রেখে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে গোলাকার অ্যালুমিনিয়ামের একটা পেট চেপটা চাক্তি। আর এই চাকতিটার খানিকটা ওপরে একটা তারের জালের ওপর বসানো রয়েছে একটা মিশমিশে কালো কেট্লি।

সুদেষ্ণা বলে উঠল, "এই তো সেই অবতল প্রতিফলক। ওটার ফোকাসে কেট্লিটা রাখা হয়েছে। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়ছে কেটলির গায়ে।"

সৌতি বলল, "আর কেটলিটার রঙ কালো করা হয়েছে যাতে বেশী তাপ শুষে নিতে পারে। কেমন সোঁ সোঁ করে বাষ্প বেরোচ্ছে ছাখ্ সুদেষ্ণা কেটলিটার মুখ থেকে।"

"বাঃ—বেশ মনে আছে দেখছি। ওই যে অ্যাডাম্স্ সাহেবের কথা বলছিলাম, উনিও অনেকটা এই রকম উনুনই তৈরি করেছিলেন। তবে অ্যালুমিনিয়ামের বদলে উনি সাধারণ আয়না বসিয়েছিলেন। আটটা আয়না, গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে, একটা উল্টো পিরামিডের মতো। এই পিরামিডের পেটের মধ্যে রান্নার পাত্র রেখে তার



রোদ্দুরের উনুন—২

অ্যাবটের অধিবৃত্তাকার (প্যারাবলিক) প্রতিফলক উনুন

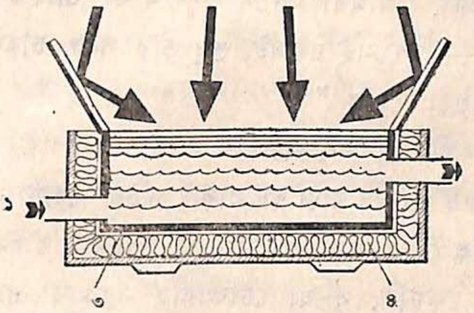
ওপর একটা কাঁচের চাকা বসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। অ্যাডাম্সের পর ১৯১৬ সালে অ্যাবট্ নামে আরেক জন একটা অন্য ধরনের

রোদ্দুরের উনুন তৈরি করেন। এ ধরনের উনুন এখনো ব্যবহার হয়। ওই ছ্যাখো ওপাশে ওই রকমই একটা উনুন রয়েছে। প্রতিফলকের আকারটা দেখেছ? যেন একটা বড় পাইপকে মাঝখান থেকে কেটে ওপরের টুকরোটা বাদ দিয়ে শুধু নীচেরটুকু রাখা হয়েছে। তবে এই প্রতিফলকটার আকারটা কিন্তু ঠিক বৃত্তের অংশ নয়। একে বলে অধিবৃত্ত। বুঝতেই পারছ এই অধিবৃত্তের ফোকাসটা একটা বিন্দু নয়—একটা লম্বা লাইন। আর এই ফোকাসের লম্বা লাইন বরাবর রয়েছে একটা কালো পাইপ। রোদ্দুর প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়ছে ওই পাইপের ওপর। পাইপের মাথার দিকে যে কালো পাত্রটা দেখছ ওর মধ্যে আছে এক রকম তেল। ওই তেলটা রোদ্দুরে তেতে আগুন হয়ে ওঠে প্রতিফলকের ভেতর দিয়ে বয়ে যাবার সময়। ওই গরম তেল ভর্তি পাইপটাকে কাজে লাগানো হয় রান্নাবান্নার জন্য। যেমন ইলেকট্রিক হিটারের কুণ্ডলী পাকানো তারগুলো যখন তেতে গনগন করে তার ওপর চড়িয়ে দেওয়া হয় রান্না। রান্নার কাজে তাপ খরচ করে তেলটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন সেটা আবার ফেরত চলে যায় কালো পাত্রটায়। তারপর ফের প্রতিফলকের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসে নতুন করে রোদ্দুর থেকে তাপশক্তি শুষে নিয়ে। এই উনুনের একটা সুবিধে হল, সূর্য অস্ত যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ তেলটা গরম থাকে আর তাই দিয়ে রান্নার কাজ চালানো যায়। এই উনুনে ৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠে।"

"আমিও কিন্তু সেই কথাই ভাবছিলাম কিরণদা।" সৌতি বলল। "যতক্ষণ রোদ্দুর থাকবে ততক্ষণই তো শুধু প্রথম উনুনটা ব্যবহার করা যাবে। সূর্য ওঠার আগে কি ডোবার পরে, এমন কি বাদলা দিনেও ওটা দিয়ে রান্না করা যাবে না।"

"শুধু তাই নয়। গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলায় একজন লোককে ঠায় চড়চড়ে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে রান্না করতে হবে। তাই না? এই

জন্যেই আমরা আরো কয়েক ধরনের উনুন ব্যবহার করি। চলো একটা করে দেখাই।”



রোদ্দুরের উনুন—৩

১—ঠাণ্ডা জল ঢোকার পথ।

২—গরম জল বেরোবার পথ।

৩—কালো রঙ-করা ধাতুর পাত বসানো পাত্র।

৪—কাঁচের তুলো (অপরিবাহী পদার্থ)

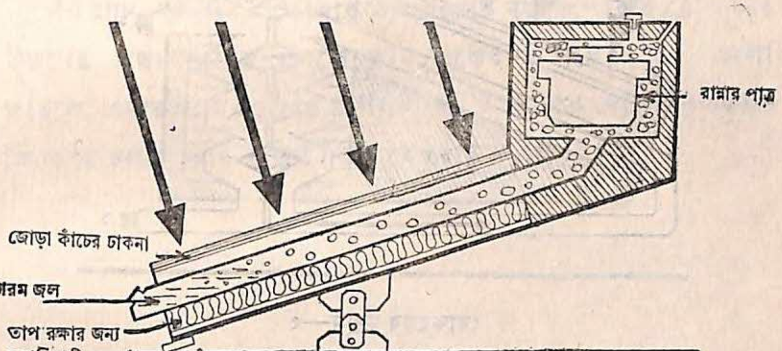
কিরণদা ওদের একটা বড়সড় চৌকো কাঠের বাক্সের সামনে নিয়ে এলেন। বাক্সটার মাথাটা ঢাকা দেওয়া ছিল। কিরণদা এক এক করে চারটে ঢাকনা খুলে দিলেন। ফুলের পাপড়ির মতো চারটা ঢাকনা চারদিকে মুখ করে হেলে পড়ল। ঢাকনার ভেতর দিকে লাগানো রয়েছে আয়না। সূর্যের আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে বাক্সের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। বাক্সের মাথায় লাগানো রয়েছে জোড়া কাঁচের ঢাকা। কিরণদা বুঝিয়ে বলেন, ওই বাক্সের ১ নম্বর মুখ দিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢোকে ভেতরে। ২ নম্বর মুখ দিয়ে বের করে দেওয়া হয় গরম জল। বাক্সটার ভেতর দিকটা মোড়া রয়েছে কালো রঙের লোহার পাত দিয়ে। আর ওই লোহার পাত আর কাঠের বাক্সর মাঝখানের অংশটায় পোরা আছে কাঁচের তুলো। কাঁচের তুলো কাঁচ থেকেই তৈরি হয়, একেবারে সরু ফিনফিনে কাঁচের সুতো। এমন জড়াজড়ি করে থাকে ঠিক যেন তুলো।

কাঁচের তুলো অপরিবাহী বস্তু। বাক্সর ভেতরে গরম জলের তাপকে বাইরে বেরোতে বাধা দেয়।

সৌতি বলল, "আমরা আগে এরকম তাপগ্রাহক চেপটা বাক্স দেখেছি। অনেকটা সেই রকমই, শুধু তার সঙ্গে চারটে আয়নার ডানা জুড়ে দেওয়া হয়েছে।"

কিরণদা বললেন, "এই বাক্সটায় তোমরা জল গরম হতে দেখছ। কিন্তু ঠিক একই ধরনের বাক্স হয় যার পেটের মধ্যেটা ফাঁকা থাকে। আর বাক্সটাকে খোলার ব্যবস্থা রাখা হয় পিছন দিক থেকে। বাটি, সস্প্যান বা কেটলি, যা-যা ঢোকাবার দরকার এইখান দিয়েই ঢোকানো হয়। তাছাড়া এরই মধ্যে আরেকটা পাত্রে রাখা হয় তাপ সংরক্ষণের জন্যে গ্লবার সল্ট। দিনের বেলায় গরমে গলে গিয়ে তরল অবস্থায় প্রচুর তাপ শুষে রাখে আর তারপর রোদ্দুর পড়ে গেলে জমা তাপটাকে ছেড়ে দেয় আস্তে আস্তে। সেই তাপে তখন রান্নার কাজ হতে পারে। প্রায় তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবধি উষ্ণতা ওঠে এই উনুনটার পেটের মধ্যে। একটু আগেই তোমাদের জামসেদপুরের মণি ঘোষের কথা বলছিলাম। তিনি যে রোদ্দুরের উনুনটা তৈরি করেছেন সেটা অনেকটা এই রকমই তবে আরো সস্তায় তৈরি করা যায়। জিনিসটা দেখতে একটা কাঠের ট্রাঙ্কের মতো। এখানে চারটে পাল্লা রয়েছে কিন্তু মণিবাবুর উনুনে একটাই পাল্লা। পাল্লাটা তুলে হেলিয়ে রাখা যায়। পাল্লার ভেতর দিকে লাগানো আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে রোদ্দুর। দিনের সব সময় সূর্যের অবস্থান এক থাকে না তাই এই আয়না বসানো পাল্লাটাকে বিভিন্ন কোণে হেলিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। মণিবাবুর উনুনের মাথাতেও জোড়া কাঁচের ঢাকনা আছে। সূর্যের আলো এই ঢাকনা ভেদ করে ভেতরে ঢোকে কিন্তু দুটো কাঁচ আর তার মধ্যে বন্দী হাওয়াকে এড়িয়ে বাইরে পালাতে পারে না। এই উনুনের বৈশিষ্ট হল, ঢাকা দেওয়া কাঁচ-দুটোর মধ্যে ওপরেরটার আকার নীচেরটার প্রায়

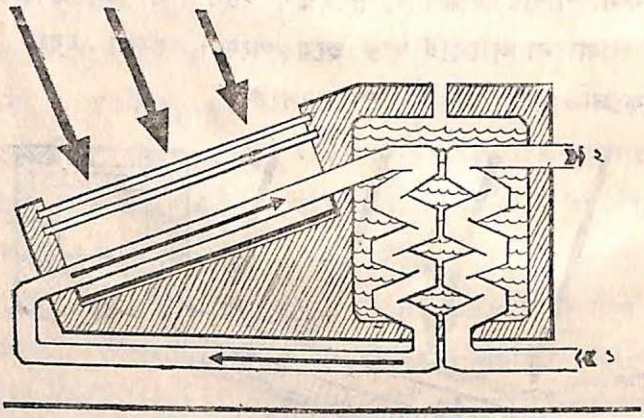
ছ' গুণ। নীচের কাঁচটা একটা কাঠের খাঁচায় আটকানো থাকে আর কাঠের খাঁচার ভেতর দিকটা কালো রঙ করা থাকে। সূর্যের আলোর খানিকটা কাঁচের প্রথম ঢাকনাটা ভেদ করে দ্বিতীয় কাঁচ-বসানো খাঁচাটার ওপরে এসে পড়ে। ফলে কালো কাঠটা ওঠে তেতে আর সেই সঙ্গে দুই কাঁচের ঢাকনার মধ্যেকার হাওয়াটাও। জোড়া কাঁচের ঢাকনার মধ্যে আটক হাওয়াটাকে এইভাবে গরম করে নিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। উনুনের পেটের মধ্যে জমা তাপের পক্ষে বাইরে পালানো আরোই শক্ত হয়ে পড়ে। চলো এবার, অনেক বকে ফেলেছি—আরেকটা উনুন দেখাই।"



রোদ্দুরের উনুন—৪
জোড়া কাঁচের ঢাকনা দেওয়া কালো চেপটা বাক্সটা রয়েছে
জানলার বাইরে রোদ্দুরে। বাক্সের বড়সড় অংশটা
রয়েছে ঘরের মধ্যে।

এবার ওরা যে উনুনটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, সেটাতে কোন প্রতিফলক নেই। জোড়া কাঁচের ঢাকনা দেওয়া চেপটা একটা কালো বাক্স। কালো বাক্সটা জানলা গলে বাইরে বেরিয়ে রয়েছে রোদ্দুর পাবার জন্যে। বাক্সের মাথার দিকটা উঁচু হয়ে বাড়ির ভেতরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে। বাক্সের মাথার দিকটা চেপটা নয় কিন্তু, বড়সড় চৌকো মতো। বেশ বোঝা যাচ্ছে এই

উনুনে রান্না করার জন্য রাঁধুনীকে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। কিরণদা বুঝিয়ে দেন, রোদ্দর এসে ওই চেপটা বাক্সের ভেতরের জলটাকে ফুটিয়ে বাষ্প করছে। সেই বাষ্প ওপরে উঠে যাচ্ছে। বাক্সের মাথার ঢাকনা খুলে রান্নার পাত্রটা বসানো হয় ওই বাষ্পের মধ্যে। রোদ পড়ে গেলেও যাতে রান্না করা যায় তার জন্যে এখানেও ওই বাষ্পের বাক্সের মধ্যে রাখা থাকে গ্লবার সল্ট।



রোদ্দুরের উনুন—৫
শীতের দেশে যেখানে ঠাণ্ডায় জল জমে যেতে পারে, এরকম তাপ-বিনিময় ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে রোদ্দুরের উনুন তৈরি করতে হয়।
১—ঠাণ্ডা জল ঢুকছে, ২—গরম জল বেরোচ্ছে।

"আরেকটা উনুন দেখিয়ে রান্নাবান্নার পাট চুকিয়ে ফেলা যাক্, কি বলো?" কিরণদা হাসতে হাসতে বলেন। "চলো, এবার আমাদের ছাতে উঠতে হবে।"

ছাতে উঠে রোদ্দুরের উনুনের মধ্যে নতুন কিছু দেখতে পেল না ওরা। কিরণদা বললেন, "দেখছ তো, তাপগ্রাহক বাক্সের মধ্যে থেকে দুটো পাইপ বেরিয়ে এসে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। এবার ঘরে চলো।"

ঘরে গিয়ে দেখা গেল তাপগ্রাহক থেকে বেরিয়ে আসা পাইপ

ছুটো ঢুকেছে আরেকটা বাক্সের মধ্যে। কিরণদা জানালেন, খুব ঠাণ্ডার দেশে যেখানে রাত্তির বেলা জল জমে যেতে পারে সেখানে তাপগ্রাহকের মধ্যে দিয়ে জলের বদলে এমন তরল পাঠানো হয় যা সহজে জমে না। এই তরল সূর্যের তাপ সংগ্রহ করে ওই বাক্সের মধ্যে সেই তাপ ছেড়ে দেয়। তারপরের ব্যাপারটা ঠিক আগের মতোই।

"তার মানে এখানে তাপ বিনিময়ের একটা বাড়তি ব্যবস্থা জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এই তো?" সুদেষ্ণা মাঝে মাঝে বেশ পণ্ডিতী ঢঙে কথা বলে।

কিরণদা বললেন, "তোমার কথা শুনেই বুঝতে পারছি রোদ্দুরের উনুনের কথা শুনতে শুনতে কান একেবারে পচে গেছে। চলো তাহলে, এবার আমরা দেখে আসি রোদ্দুর চোরের দেশের কলকব্জা কি করে চলছে আর ইঞ্জিন কিভাবে রোদ্দুর চুরি করছে।

রোদ্দুর চুল্লী

কিরণদার সঙ্গে একটা কারখানার বিরাট গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। গেটের মাথায় লেখা রয়েছে "সোলার মেটালার-জিকাল ফার্নেস কম্পানি।"

কিরণদা বললেন, "এখন আমাদের দেশে এরকম অনেক কম্পানি দেখতে পাবে। এখানে সূর্যের তাপের সাহায্যে ধাতু নিষ্কাষণ, পরিশোধন ইত্যাদি নানা কাজ করা হয়। আজ থেকে নয়, বহুকাল ধরেই এই রকম সৌর চুল্লী তৈরি শুরু হয়েছে। বেশীর ভাগ সৌর চুল্লীতেই অবতল প্রতিফলক ব্যবহার করা হয় সৌর শক্তি ছোট্ট একটা জায়গায় ঘনীভূত বা জড়ো করার জন্য। সৌর চুল্লীতে জ্বালানীর খরচ লাগে না সেই সুবিধে তো আছেই তাছাড়াও আরো অনেকগুলো সুবিধে পাওয়া যায়। যেমন ধরো, এই চুল্লীতে যে-কোন ধাতু অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাবে গলানো যায়। সাধারণ জ্বালানী পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন করতে গেলেই ধোঁয়া ইত্যাদি বেরোবেই। সেই ধোঁয়া বা ময়লার ছোঁয়া বাঁচিয়ে ধাতুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা দারুণ শক্ত ব্যাপার। সেদিক দিয়ে রোদ্দুরের চুল্লীর মতো 'পরিষ্কার' উত্তাপ আর কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়। তোমরা সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভোয়েসিয়ের নাম শুনেছ। তিনিই প্রথম রোদ্দুর ব্যবহার করে উচ্চ তাপমাত্রায় রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তাঁর সৌর-চুল্লীতে অবশ্য প্রতিফলক ব্যবহার করা হয়নি। একজোড়া পেট মোটা কাঁচের মধ্যে সুরা ভরে তৈরি করা হয়েছিল লেন্স। সেই লেন্স ভেদ করে সূর্যরশ্মি ফোকাসে এসে জড়ো হত। ল্যাভোয়েসিয়ের বলেছিলেন, 'সাধারণ চুল্লীর তুলনায় সূর্যের তাপ অনেক পরিষ্কার বলে মনে হয়।' "

"রোদ্দ র চুল্লীতে কি রকম উষ্ণতা পাওয়া যায় ?" সৌতি প্রশ্ন করল।

"সেটা নির্ভর করে চুল্লীর গড়নের ওপর। ধরো অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি একটা ১০ ফুট ব্যাসের ঝকঝকে অবতল প্রতিফলক দিয়ে তুমি চুল্লী তৈরি করলে। এবার যদি সূর্যের প্রতিফলিত আলোকে একটা চার আনার আকারের সমান গোল জায়গার মধ্যে জড়ো করা যায় তাহলে—এই ধরো ৮৫০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো উষ্ণতা পেতে পারো ওইখানটায়।"

"ওরেব্ বাবা। লোহাই তো শুনেছি ২৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে গলে যায়।" সৌতি প্রায় লাফিয়ে উঠল।

"ঠিকই তো। ধাতুর মধ্যে টাঙস্টেন সবচেয়ে বেশী উষ্ণতায় গলে—৬১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। তার মানে তুমি এই চুল্লীতে টাঙস্টেনকেও গলিয়ে ফেলতে পারবে।"

"আচ্ছা, সূর্যের পিঠের দিকের উষ্ণতা তো ১০,০০০ ডিগ্রি। তাহলে প্রায় সূর্যের সমান তাপ দেয় বলুন এই চুল্লীগুলো ?" এবার সুদেষ্ণার প্রশ্ন।

"সুদেষ্ণা—তাপ আর উষ্ণতা এক জিনিস নয় কিন্তু। গুলিয়ে ফেলো না। রোদ্দুরের চুল্লীর উষ্ণতাটা খুব বেশী হলেও সেটা কিন্তু খুব ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে। আর সূর্যের সারাটা পিঠ জুড়েই ওই বিপুল উষ্ণতা। তার মানে রোদ্দ্ র চুল্লীর তাপ সূর্যের কাছে কিছুই নয়। এবার বুঝতে পেরেছ ?"

"হ্যাঁ। রোদ্দ র চুল্লী খুব ছোট্ট একটা জায়গায় প্রায় সূর্যের কাছাকাছি উষ্ণতা সৃষ্টি করতে পারে।" সুদেষ্ণা নিজের মতো করে বুঝে নিল ব্যাপারটা।

"রোদ্দ্ র চুল্লী আর কি কি কাজে লাগে কিরণদা ?" সৌতি জানতে চাইল।

"ধাতু গলাই করার কাজ ছাড়াও রোদ্দ্ র চুল্লী নানারকম জটিল

গবেষণার কাজে সাহায্য করে। মানে, যেখানেই 'রোদ্দুরের বিশুদ্ধ তাপ'-এর প্রয়োজন। ইলেক্‌ট্রিক চুল্লীতেও এরকম বিশুদ্ধ উত্তাপ পাওয়া যায় না। সেখানে আবার বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গেরা হাঙ্গামা বাধায়। এই চুল্লী গবেষণাগারে তাপমাত্রা, গলনাঙ্ক, তাপ-বিদ্যুৎ, বাষ্পীভবনের মাত্রা ইত্যাদি নির্ভুলভাবে মাপার কাজে লাগে। তাছাড়া একক-স্ফটিক পদার্থ বলে এক ধরনের জিনিস তৈরির কাজে এই চুল্লী অপরিহার্য। সৌর ব্যাটারির কথা বলেছিলাম মনে আছে? এই সৌর ব্যাটারি তৈরির জন্য একক-স্ফটিক পদার্থ সিলিকন দরকার হয়। তাছাড়া খুব উচ্চ তাপমাত্রায় দুটো ধাতুকে জোড়া, যাকে ওয়েল্ডিঙ বলে, এটা সেই কাজেও ব্যবহার হয়। তবে সৌর চুল্লীর সবচেয়ে আধুনিক ব্যবহার হচ্ছে চাঁদের পিঠের পাথরকে তাতিয়ে তার থেকে জল বার করার চেষ্টা।"

"তার মানে?"

"তার মানে মহাকাশযানে করে চাঁদের পিঠে পৌঁছবার পর সেখানে কয়েকটা বিরাট সৌর চুল্লী বসানো হয়েছে। সেই সৌর চুল্লী সূর্যের আলোকে চাঁদের পাথরের ওপর ফেলে তাতিয়ে তুলছে। যদি কোথাও পাথরের মধ্যে জল থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয় এই তাপে তা বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসবে। এখনো অবধি অবশ্য জলের খোঁজ পাইনি আমরা।"

কিরণদার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরেই দেখতে পাচ্ছিল সামনে একটা বিরাট উঁচু বাড়ি রয়েছে। রাস্তা ঘুরে বাড়ির সামনের দিকটায় এসে পৌঁছতেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। প্রায় একশো ফুট উঁচু বাড়ির একটা দেওয়াল ভর্তি শুধু ছোট ছোট কাঁচের আয়না। অজস্র আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে একটা সূর্যকেই যেন হাজার হাজার সূর্য বলে মনে হচ্ছে। বাড়ির দেওয়ালটা সিধে নয়। পেটের মাঝখানটা চেপটা ডোঙার মতো।

কিরণদা বললেন, "দেওয়ালটার আকৃতি অবতল প্রতিফলকের মতো। তাই ওটার গায়ে বসানো আয়নাগুলো থেকে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যের আলো খুব ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে এসে জড়ো হচ্ছে।"

কিন্তু আয়না যে শুধু বাড়ির বাইরের দেওয়ালটাতেই আছে তাই নই, দেওয়ালটার সামনে বিরাট চত্বর জুড়ে মাটির ওপরেও সাজানো রয়েছে আয়না—সংখ্যায় বোধহয় আরো বেশী। সিঁড়ির মতো ধাপ কাটা হয়েছে মাটিতে, আর প্রতি ধাপেই সারি সারি আয়না।

"মাটির ওপর এত আয়না রয়েছে কেন?" সুদেষ্ণা জানতে চায়।

"এগুলোকে বলে হিলিওস্ট্যাট্। এখানে মাটির ওপর প্রায় তেষট্টিটা ধাপ আছে দেখো। খুব ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে যদি নজর করো তো দেখবে যে মাটির ওপর বসানো এই আয়নাগুলো কিন্তু একটু একটু করে নড়ছে। আকাশে সূর্যের অবস্থান পাল্টানোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই আয়নাগুলো নড়েচড়ে। সূর্যরশ্মি এই নড়বড়ে আয়নাগুলো থেকে ঠিকরে এসে বাড়ির দেওয়ালে ওই অধিবৃত্তাকার প্রতিফলকে গিয়ে পড়ে। হিলিওস্ট্যাট ব্যবহার না করলে এই সৌর চুল্লী দিনের মধ্যে একটা মাত্র সময় শুধু খানিকক্ষণের জন্য চালু থাকতো।"

"এখানে কিরকম উষ্ণতা পাওয়া যায়?"

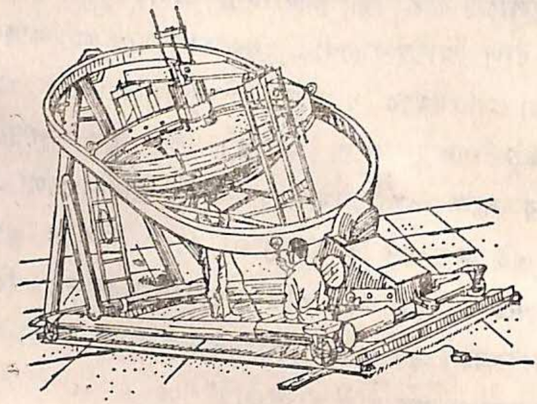
"প্রায় সাড়ে চার হাজার ডিগ্রির মতো। এখানে কয়েকশো পাউণ্ড লোহা চোখের নিমেষে গলিয়ে ফেলা একটুও শক্ত ব্যাপার নয়।"

কালো চশমা পরেও বেশীক্ষণ ওই প্রতিফলকের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। কিরণদার পিছনে পিছনে দু'জনে এগোতে শুরু করল।

একটু বাদেই একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্র দেখা গেল মাঠের

মধ্যে। লোহালক্কড়ের হিজিবিজির মধ্যে অবতল প্রতিফলকটা ঝকমক করছে। প্রায় দশ ফুট ব্যাস হবে। কিরণদার কাছে জানা গেল এটার নাম কন্‌ভেয়ার চুল্লী। প্রতিফলকটা পালিশ করা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। ফোকাসের কাছে একটা চার আনার আকারের সমান ছোট্ট একটা জায়গায় সূর্যের আলোকে জড় করা হচ্ছে। এখানে নাকি আট হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইটের চেয়েও বেশী উষ্ণতা পাওয়া যায়। সেকেণ্ডের মধ্যে একটা আধ-ইঞ্চি মাপের ইস্পাতের ইস্ক্রুপকে গলিয়ে দিতে পারে।

কিরণদা বললেন, "এই চুল্লীর একটা বৈশিষ্ট আছে। একে আমরা সূর্যমুখী চুল্লী বলতে পারি। সূর্য যখন যেখানে থাকবে এই



সূর্যমুখী কন্‌ভেয়ার সৌরচুল্লী

চুল্লীও ঠিক সেইদিকে মুখ ঘোরাবে যাতে সবচেয়ে বেশী তাপ সংগ্রহ করতে পারে। দম দিলে ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ঘোরে, এখানেও তেমনি একটা মটর চালিয়ে চুল্লীটাকে ধীরে ধীরে ঘোরানো হয় সূর্যের গতির সঙ্গে তাল রেখে। এরকম চুল্লী আমাদের দেশের বহু কারখানাতেই ব্যবহার করা হয়। জায়গাও বেশী লাগে না, দামের দিক থেকেও সস্তা।"

সূর্যমুখী চুল্লী দেখে রাস্তায় বেরিয়ে কিরণদা বললেন, "এবার তোমাদের কয়েকটা রোদ্দুরের ইঞ্জিন দেখাবো।"

"রোদ্দুরের ইঞ্জিন?"

"তোমরা যদি বাষ্পের ইঞ্জিনের কথা জানো তাহলে রোদ্দুরের ইঞ্জিন দেখে খুব একটা অবাক হবে না।"

"বাষ্পের ইঞ্জিনের কথা জানবো না? রেলগাড়ির ইঞ্জিন তো আগে শুধু বাষ্পের ইঞ্জিনই হত। তারপর তো ডিজেল ও ইলেকট্রিক ট্রেন এল।" সুদেষ্ণা বলল।

"বাষ্পের ইঞ্জিন শুধু রেলগাড়িই টানত না। কলকারখানার যন্ত্রের চাকা ঘোরাতে শুরু করে এই বাষ্পের ইঞ্জিন। আধুনিক যন্ত্রযুগ শুরু হয় বাষ্পের ইঞ্জিনের দৌলতে। জলে স্টীমার, রাস্তায় বাষ্পের গাড়ি, রেলের ওপর বাষ্পের ইঞ্জিন—সবই বাষ্পশক্তি ব্যবহার শুরু হবার পর দেখা দেয়। এমন কি আকাশে প্লেনও ওড়ানো হয়েছে বাষ্পের ইঞ্জিন ব্যবহার করে। কিন্তু সুদেষ্ণা, বাষ্পের ইঞ্জিন থেকে কিভাবে আমরা শক্তি পাই সেটা কি তুমি জানো?"

"হ্যাঁ। বয়লার নামে একটা পাত্রের মধ্যে জল থাকে। কয়লা পুড়িয়ে সেই তাপে জলটাকে গরম করতে করতে এক সময় সেটা টগবগ করে ফুটতে শুরু করে। জল ফুটে বাষ্প হয়। সেই দারুণ গরম বাষ্প উচ্চ চাপে একটা যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। তার নাম সিলিণ্ডার। সিলিণ্ডারের মধ্যে থাকে আরেকটা যন্ত্র। তার নাম পিস্টন। বাষ্প এই পিস্টনটাকে ক্রমাগত ঠেলাঠেলি করে সিলিণ্ডারের মধ্যে। এইভাবে বাষ্পের শক্তি ব্যবহার করে যন্ত্রশক্তি পাওয়া যায়। এই যন্ত্রশক্তি কখনো ইঞ্জিনের চাকা ঘুরিয়ে রেলগাড়ি টানে আবার কখনো কলকারখানার যন্ত্রপাতি ঘোরায়।"

"বাঃ—খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছ। এবার রোদ্দুরের ইঞ্জিনের কথা বলি। প্রথমে তোমাদের যেসব রোদ্দুরের ইঞ্জিন দেখাবো, তার সবগুলোই কিন্তু আসলে বাষ্পের ইঞ্জিন।"

"তাহলে রোদ্দুরের ইঞ্জিন বলছেন কেন?" সৌতি চেপে ধরল সঙ্গে সঙ্গে।

"রোদ্দুরের ইঞ্জিন বলছি কারণ বাষ্পের ইঞ্জিনে কয়লা পোড়ানো হয় জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি করার জন্যে। কিন্তু রোদ্দুরের ইঞ্জিনে—"

"রোদ্দুর দিয়ে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি হয় আর সেই বাষ্প চালায় ইঞ্জিন।" সুদেষ্ণা মহা উৎসাহে কিরণদাকে কথাই শেষ করতে দিল না।

রোদ্দুরে ঘোরে কলের চাকা

কিরণদা পাশের বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "চলো—এই ছাপাখানাটা একবার দেখে আসি।"

বাড়িটার সামনে আসতেই একটা সাইনবোর্ড দেখা গেল—'সূর্যকিরণ মুদ্রণ সংস্থা'।

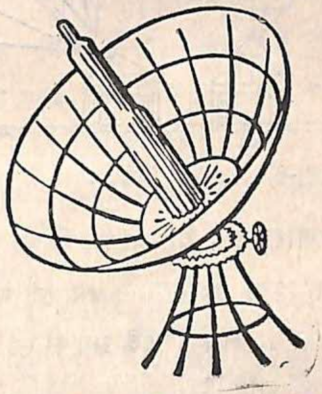
সৌতি একবার চোখ বুলিয়েই বলল, "এখানে সূর্যের আলো দিয়েই নিশ্চয় ছাপাখানার যন্ত্রের চাকা ঘোরানো হচ্ছে।"

"ঠিক ধরেছ। চলো ভেতরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসি।"

সামনের গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একতলা বাড়িটার সামনে খানিকটা খোলা জায়গা চোখে পড়ল। এখানেও সেই উল্টোনো ছাতার মতো বিরাট একটা চকচকে ধাতুর পাত সূর্যের দিক মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। অবতল প্রতিফলকের ঠিক মাঝখানে কালো রঙের একটা মোটা নল খাড়া হয়ে রয়েছে ছাতার ডাঁটির মতো। উঁচু নলটা থেকে বেরিয়ে এসেছে দু'টো সরু সরু

পাইপ। পাইপ দুটো একটা বিরাট বোতলের গায়ে এসে ঢুকেছে। বোতলের সঙ্গে লাগোয়া একটা যন্ত্র ফোঁশ ফোঁশ করছে আর তার চাকা ঘুরছে বনবনিয়ে। চাকার সঙ্গে লাগানো রয়েছে একটা বেল্ট। বেল্টের অন্য প্রান্তটা গিয়ে ঢুকেছে ঘরের ভেতরে। ঘরের ভেতর পা দিতেই দেখা গেল ঘটাঙ ঘটাঙ শব্দে ছাপাখানার যন্ত্র চলছে। ওই বেল্টটাই ঘোরাচ্ছে যন্ত্রের চাকা।

কিরণদা বোঝান, "অ্যালুমিনিয়াম প্রতিফলকের মাঝখানে মোটা নলটায় আছে জল। সেই জল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে ওই বড় বোতলটার মধ্যে এসে জমা হয়। তারপর সেটা প্রয়োজন মেতো বাষ্পের ইঞ্জিনে ঢোকে আর ফোঁস ফোঁস করে ইঞ্জিনের চাকা ঘোরায়।"

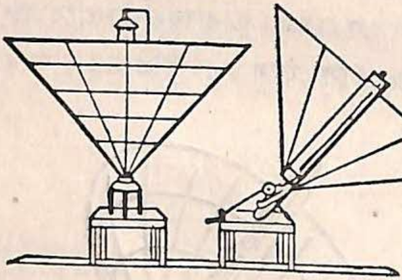


পিফ্‌রের রোদ্দুরের ইঞ্জিনের প্রতিফলক ও বয়লার—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ

সৌতি জিগ্যেস করল, "কিরণদা, কে প্রথম রোদ্দুরের ইঞ্জিন তৈরি করেন?"

"যতদূর জানা যায় প্রথম রোদ্দুরের ইঞ্জিন তৈরি করেন অগাস্তিন মুশো (Mouchot) নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক ১৮৬১ সালে। তাঁর অবতল প্রতিফলকের মাথার দিকটার ব্যাস ছিল আট ফুট। টুকরো টুকরো ধাতুর পাত জুড়ে তিনি এটা তৈরি করেছিলেন। তারপর ধাতুর ওপর রূপোর একটা আবরণ লাগিয়ে নিয়েছিলেন।

এই প্রতিফলকের ফোকাসে রাখা বয়লারে জল ফুটিয়ে তিনি বাষ্পের ইঞ্জিন দিয়ে একটা জলতোলা পাম্প চালিয়েছিলেন। মুশো-র রোদ্দুরের ইঞ্জিনের বৈশিষ্ট হল, প্রতিফলকের ফোকাসে তিনি একটার বদলে অনেকগুলো নলে জল গরম করতেন আর সব কটা নলই থাকতো একটা কাঁচের খোলসের মধ্যে। তাছাড়া সূর্যের অবস্থান মতো প্রতিফলকের মুখ ঘোরাবার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন।"



মুশো-র রোদ্দুরের ইঞ্জিন—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ

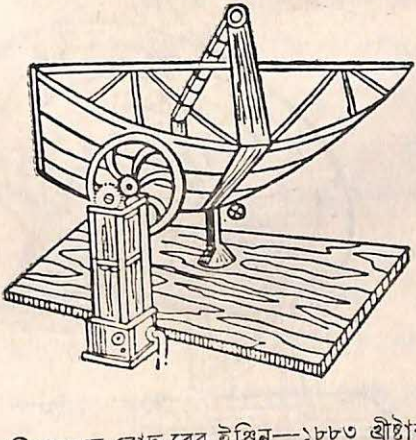
ছাপাখানার লোকেরা ইতিমধ্যে ভিড় জমিয়েছে সৌতিদের ঘিরে। কিরণদার কথা শুনে একজন চট করে আলমারি খুলে একটা বই বার করে আনল। "এই ছাখো ভাই, মুশো-র রোদ্দুরের ইঞ্জিনের প্রতিফলকের ছবি।"

কিরণদা বললেন, "তোমরা এই ছাপাখানায় যে রকম রোদ্দুরের ইঞ্জিন দেখছ ঠিক এই ধরনের একটা ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন ফ্রান্সেরই আরেকজন লোক। তাঁর নাম আবেল পিফ্রে। শুধু তাই নয়, তিনি সেই ইঞ্জিন দিয়ে একটা ছাপাখানার যন্ত্রও চালিয়েছিলেন ১৮৭৮ সালে।"

"১৮৭৮ সালে! কিন্তু তারপর লোকে রোদ্দুরের ইঞ্জিনের কথা একেবারে ভুলে মেরে দিল কেন?" সৌতি প্রশ্ন করে।

"ঠিক ভুলে গেছল বলা ঠিক নয়। অনেকেই এই নিয়ে গবেষণা

করেছেন। আসলে তখনো কয়লা বা তেলে টান পড়েনি। সেটা ছিল কয়লা পুড়িয়ে বাষ্পের ইঞ্জিন বা তেল পুড়িয়ে মোটরগাড়ি চালানোর যুগ। যান্ত্রিক শক্তির সব প্রয়োজন এরাই মিটিয়ে ফেলত। সেইজন্যেই রোদ্দুরের ইঞ্জিনের কদর হয়নি তখন। ব্যবসাদাররাও রোদ্দুরের ইঞ্জিন তৈরি করার জন্য বিজ্ঞানী বা যন্ত্রবিদদের সাহায্য করতে চাননি। শুনলে অবাক হয়ে যাবে, বোম্বেতে ১৮৭৬ সালে অ্যাডাম্‌স বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক বিশাল একটা রোদ্দুরের ইঞ্জিন তৈরি করেন। ১৭ ইঞ্চি লম্বা ও ১০ ইঞ্চি চওড়া, এই মাপের টুকরো টুকরো অসংখ্য আয়না দিয়ে তিনি এক অবতল প্রতিফলক তৈরি করেন। এক কানা থেকে আরেক কানা অবধি সেই প্রতিফলকের দৈর্ঘ্য ছিল ৪০ ফুট। অ্যাডাম্‌স্ এই প্রতিফলকের সাহায্যে যে বাষ্প তৈরি করতেন সেটা দিয়ে চলত ২½ অশ্বক্ষমতার একটা বাষ্পের ইঞ্জিন। বাষ্পের ইঞ্জিনটাকে কাজে লাগিয়ে জল তুলে সব্বাইকে তাজ্জব করে দিয়েছিলেন তিনি। অ্যাডাম্‌স্ ছাড়া জন এরিক্‌সন নামে সে-যুগের এক বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারও

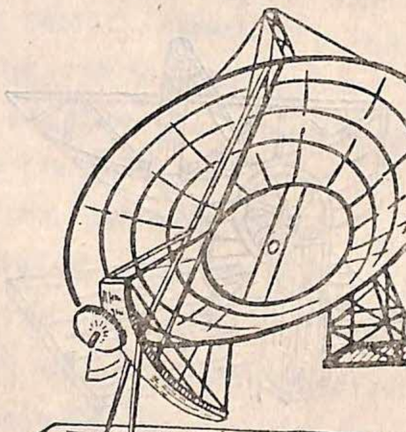


এরিকসনের রোদ্দুরের ইঞ্জিন—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ

অনেকগুলো রোদ্দুরের ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন। সেগুলোকে তিনি নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখান।

তাঁর রোদ্দুরের ইঞ্জিনগুলোর মধ্যে ১১ ফুট লম্বা, ১৬ ফুট চওড়া পেট-চেপটা প্রতিফলকওলা একটা ইঞ্জিন সবচেয়ে ভাল কাজ করেছিল। ১৮৮৩ সালে তিনি এটা তৈরি করেন। প্রতিফলকটা ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি করে তার মধ্যে তিনি টুকরো টুকরো আয়না বসিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিফলকটা তার আকৃতির জন্যে সূর্যের আলোকে একটা সরলরেখা বরাবর জড় করতো। যেমন দেখেছ তোমরা অ্যাবটের অধিবৃত্তাকার রোদ্দুরের উনুনের ছবিতে (পৃঃ ৭৯), অর্থাৎ এর ফোকাস ছিল একটা সরলরেখা বরাবর। ওই সরলরেখার ওপরই এরিক্সন বসিয়েছিলেন তাঁর লম্বা পাইপের আকারের বয়লার।"

কিরণদার মুখে এরিকসনের নাম শোনা মাত্র ছাপাখানার উৎসাহী ভদ্রলোক এরিকসনের ইঞ্জিনের ছবি বার করে ফেললেন। সৌতি বলে উঠল,"ছবিতে ওই যে দুটো চাকার মতো দেখছি, ওইগুলো ঘুরিয়েই নিশ্চয় প্রতিফলকটাকে সূর্যের দিকে মুখ করে রাখা হত।"



ইনিয়াসের রোদ্দুরের ইঞ্জিন—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ

"ঠিক ধরেছ। ছবির একেবারে মাঝখানে আর ওপর দিকে

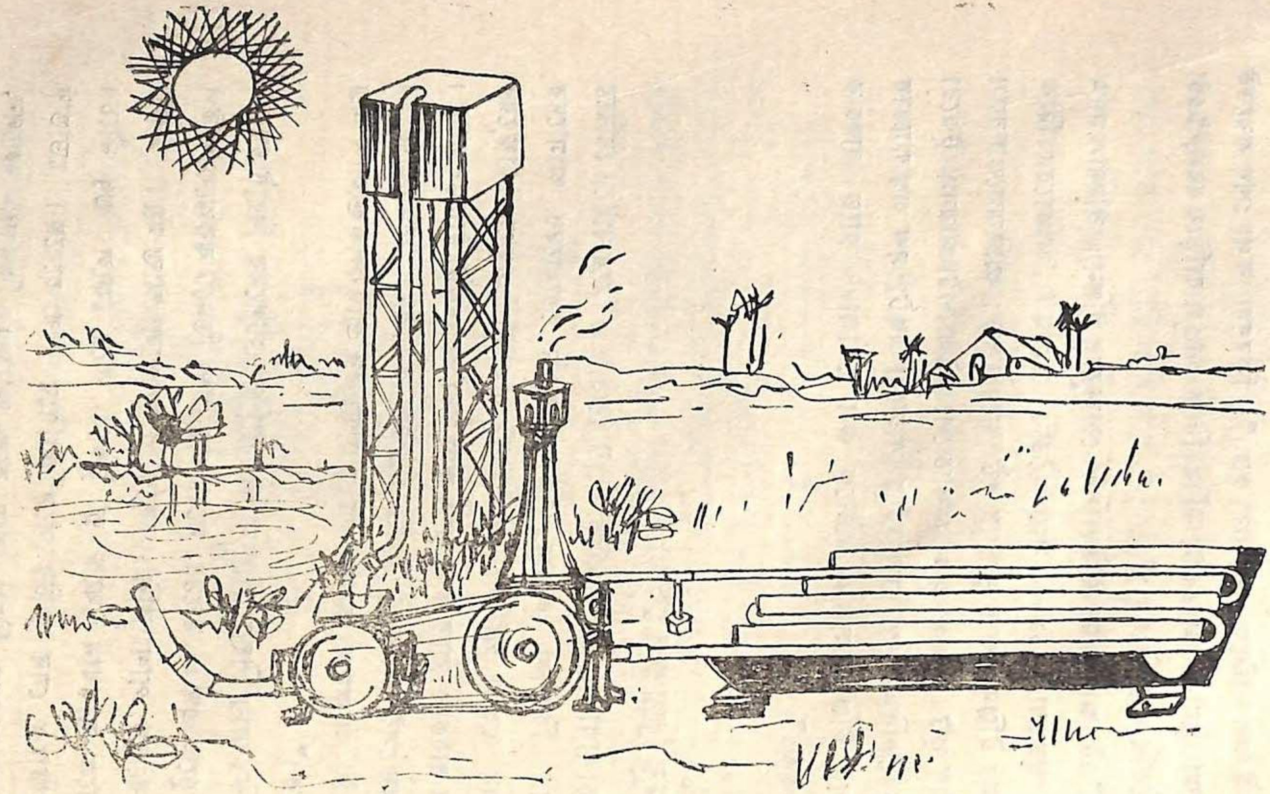
একটা পাইপ আছে দেখতে পাচ্ছ? ওটাই বয়লার। ওর মধ্যে দিয়েই জল পাঠিয়ে বাষ্প করা হত।" কিরণদা কথা শেষ করতেই সুদেষ্ণা এবার আরেকটা ছবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে ধরল, "এটা কে তৈরি করেছিলেন?"

"ওটা আরেকটা ঐতিহাসিক রোদ্দুরের ইঞ্জিন। ইনিয়াস নামে এক ভদ্রলোক ১৯০১ সালে তৈরি করেন। আকারের দিকে আগের ইঞ্জিনগুলোর তুলনায় এটা অনেক বড়। প্রতিফলকের ব্যাস তেত্রিশ ফুট। এক হাজার সাতাশো অষ্টআশিটা আয়নার টুকরো জুড়ে তৈরি এই প্রতিফলকটার সাহায্যে একটা দশ অশ্ব ক্ষমতার বাষ্পের ইঞ্জিন চলত। এটাকে জল তোলার কাছে ব্যবহার করা হত।"

রোদ্দুর দিয়ে জল তোলা

ছাপাখানার ভদ্রলোককে সবাই ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। কিরণদা বললেন, "এবার আমি তোমাদের আমাদের শহরের একটা পাম্পিং স্টেশনে নিয়ে যাব। এখানে রোদ্দুরের ইঞ্জিন ব্যবহার করে জল তুলে জমা করা হয় একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে। তারপর সেই জল বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করা হয়। এই রোদ্দুরের ইঞ্জিনটা আকারে অনেক বড় তাছাড়া এর প্রতিফলকগুলোও অন্য ধরনের।"

কিরণদার পিছনে পিছনে ওরা পাম্পিং স্টেশনের বিরাট চত্বরের মধ্যে ঢুকে এল। মাঠের মধ্যে লম্বা লম্বা তিনটে ঝকঝকে পাইপ পড়ে রয়েছে পাশাপাশি। তবে পাইপগুলো আস্ত নয়। একটা পাইপকে মাঝখান থেকে দু' টুকরো করে ফেলে শুধু নীচের টুকরোটাকে যেন মাটির সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। ডোঙার মতো আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে। কিরণদা বললেন,



অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক সমেত রোদ্দুরের ইঞ্জিন দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা

"এগুলোকে অধিবৃত্তাকার বা প্যারাবলিক প্রতিফলক বলে। বৃত্ত কাকে বলে তোমরা নিশ্চয় জানো। এগুলো যে শুধু বৃত্তের অর্ধেক তাই নয়, এর বাইরের কানা দুটো আরেকটু বেশী বাইরের দিকে ছড়ানো। জ্যামিতির বইয়ে দেখে নিও অধিবৃত্ত কাকে বলে বা কি করে আঁকা যায়। (অ্যাবটের অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক উনুনের ছবিটা আরেকবার দেখে নিতে পারো)। তোমরা আগে দেখেছ একটা অবতল প্রতিফলক সূর্যের আলোকে একটা বিন্দু, বা সেই বিন্দুকে ঘিরে ছোট্ট একটা গোল জায়গার মধ্যে জড় করে। তাই অবতল প্রতিফলকের বয়লারটার সামান্য একটা অংশ শুধু তাপ সংগ্রহ করে। অধিবৃত্তাকার প্রতিফলকে ফোকাসটা কিন্তু বিন্দু নয়, একটা সরলরেখা। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে এই রেখা বরাবর জড় হয়। তাই এখানে আমরা একটা পাইপকে প্রতিফলকের ফোকাসে রাখতে পারি। চেয়ে দেখো, তিনটে অধিবৃত্তাকার প্রতিফলকের মধ্যে দিয়ে একটা কালো পাইপ গেছে ঘুরে ফিরে। ওই কালো পাইপটাই বয়লার। এর একদিক দিয়ে ঠাণ্ডা জল পাঠানো হয় আর অন্য দিক দিয়ে বাষ্প বেরোয়। বাষ্পের ইঞ্জিন কোনটা বুঝতে পারছ তো? প্রতিফলকের ঠিক বাঁ দিকে রয়েছে। বাষ্পের ইঞ্জিনের চাকার সঙ্গে জল-তোলা কলের চাকাটা বেল্ট দিয়ে লাগানো আছে। জল-তোলা কল জল তুলে জমা করছে ওই উঁচু ট্যাঙ্কটার মধ্যে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন মতো বয়লারে জল সরবরাহের কাজটাও ওই জল-তোলা কলটাই করে।"

পাম্পিং স্টেশান ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে কিরণদা বললেন, "এই রকম অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক ব্যবহার করে প্রথম বাষ্পের ইঞ্জিন চালিয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক শ্যুমান নামে এক আমেরিকান। ১৯০৭ সালে তিনি চার একর জমি নিয়ে তাঁর কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রথম ইঞ্জিনে তিনি অবশ্য প্রতিফলক ব্যবহার করে বাষ্প তৈরি করেননি। লম্বা লম্বা অগভীর কতকগুলো নালার মতো খুঁড়ে নিয়েছিলেন

প্রথমে। তারপর মাটির ওপর অ্যাস্‌ফাল্টের একটা আবরণ দিয়ে নিয়েছিলেন যাতে নালাগুলোয় জল রাখলে মাটি সেই জল শুষে নিতে না পারে। নালায় ইঞ্চি তিনেক মতো জল ঢেলে তার ওপর তিনি প্যারাফিন তেল ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে জল খুব ভাল করে তাপ সংগ্রহ করতে পারে। তারপর তিনি নালাগুলোর মাথায় বসিয়ে দিয়েছিলেন কাঁচের ঢাকনা। এই ভাবেই তাঁর প্রথম রোদ্দুরের ইঞ্জিনের বয়লার তৈরি হয়েছিল। তবে শ্যুমানের সবচেয়ে বড় কীর্তি মিশরে কায়রোর কাছে ১৯১২ সালে 'ইস্টার্ন সান্ পাওয়ার কম্পানি' স্থাপন। এখানে তিনি এক বিশাল রোদ্দুরের ইঞ্জিন বসিয়েছিলেন নীল নদ থেকে জল তুলে সেচের ব্যবস্থা করবার জন্য। শ্যুমানের ইঞ্জিনের প্রতিফলকগুলো ছিল এখানকার পাম্পিং স্টেশানের মতোই অধিবৃত্তাকার। ছ'শো চার ফুট লম্বা সাত সাতটা প্রতিফলক বসিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ইঞ্জিন পঁয়ষট্টি অশ্বক্ষমতা দিত। সে-যুগের বিচারে এক অভাবনীয় কীর্তি।"

"এতকাল আগে এত বড় রোদ্দুরের ইঞ্জিন তৈরি হয়েছিল অথচ আমরা কেউ জানতামই না, শ্যুমান বলে কারুর নামই শুনিনি।"

"না শোনাটাই স্বাভাবিক। ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর এই কম্পানি বন্ধ হয়ে যায়। কাজ করার লোকের অভাব, সরকারী তরফে উৎসাহের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে।"

কিরণদা বললেন, "তোমাদের দেশে তো এখন খুব লোড্-শেডিঙের উপদ্রব, কিন্তু লোডশেডিঙ কেন হচ্ছে জানো ?"

"আমাদের অনেক বিদ্যুৎ প্রয়োজন, কিন্তু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তত দিতে পারছে না।" সুদেষ্ণা বলল।

"শুধু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রই নয়, তার সঙ্গে আছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র—সব মিলিয়েও ঘাটতি পূরণ করা যাচ্ছেনা। তার ওপর কয়লা নেই, তেল নেই···" সৌতি যোগ করল।

"রোদ্দুরকে কাজে লাগাতে শেখবার পর আমরা এইসব সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছি। রোদ্দুরকে কাজে লাগিয়ে বেশ কয়েক ধরনের বড় আকারের বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হল রৌদ্র-তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সমুদ্র-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহাকাশ মাইক্রোওয়েভ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এর মধ্যে রৌদ্র-তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে রোদ্দুরের ইঞ্জিনের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। চলো, আমরা বরং রৌদ্র-তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটা একবার দেখে আসি।"

রৌদ্র-তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র-র বিরাট দরজার সামনে প্রহরীরা দাঁড়িয়েছিল। কিরণদার সঙ্গে কথা বলার পর তারা গেট খুলে দিল। ভেতরে ঢুকেই চোখে পড়ল বাঁ দিকে একটা কাঠের গম্বুজ। ঘোরানো একটা সিঁড়ি লাগানো রয়েছে তার গায়ে। কিরণদা জানালেন, এটা দর্শকদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এর মাথায় চড়লেই সব দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রায় তিনতলার মতো সিঁড়ি ভেঙে সকলে ওপরকার ঘরে এসে ঢুকল। ঘরটার এক পাশে চার পাঁচটা কালো কাঁচ বসানো জানলা।

"জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াও তাহলেই সব দেখতে পাবে।" কিরণদা বললেন। "প্রতিফলকের ঝলসানিতে চোখ খারাপ হবার ভয় আছে বলে জানলায় কালো কাঁচ লাগানো আছে।"

জানলার সামনে দাঁড়াতে প্রথমেই চোখে পড়ল মনুমেণ্টের মতো লম্বা একটা মোটাসোটা স্তম্ভ রয়েছে কিছুটা দূরে। তারপরেই একটা রেলগাড়ি দেখা গেল। স্তম্ভটাকে মাঝখানে রেখে গোল পথে ঘুরছে। ইঞ্জিনের পিছনে জোড়া রয়েছে বেশ কয়েকটা বগি। বগি তো নয় এক একটা বিশাল আয়না। সূর্যের আলো ওই ঘুরন্ত আয়নাগুলোর গা থেকে ঠিকরে এসে স্তম্ভের মাথায় একটা কালো চোঙার ওপর পড়ছে।

সুদেষ্ণা দেখতে দেখতেই বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি। ওই কালো চোঙাটাই হচ্ছে বয়লার। জল ফুটে বাষ্প হচ্ছে ওখানে।"

"হ্যাঁ। ওই বাষ্পই বাষ্পের ইঞ্জিনের চাকা ঘোরাচ্ছে। বাষ্পের ইঞ্জিনের চাকা ঘুরলেই সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ তৈরির মেশিন জেনারেটারের চাকাও ঘুরছে। এইভাবেই রোদ্দুর থেকে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। রাশিয়ায় প্রথম এইভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়।"

গরম হাওয়ার ইঞ্জিন

রৌদ্র-তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বেরোবার পথে সুদেষ্ণা প্রশ্ন করল, "কিরণদা, আমরা এ অবধি যত রোদ্দুরের ইঞ্জিন দেখলাম, সব তো গোদা গোদা, বিরাট চেহারা। ছোটখাট আকারের রোদ্দুরের ইঞ্জিন হয় না? বাড়িতে পাম্প চালাবার জন্যে আপনারা কি ধরনের ইঞ্জিনে ব্যবহার করেন?"

"বাড়িতে ছোটখাট যন্ত্রপাতি চালাবার জন্যে সরাসরি বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুতের তো কোন অভাব নেই। তুমি

ছোটখাটো রোদ্দুরের ইঞ্জিনের কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? হ্যাঁ, ওই রকম ইঞ্জিনও আছে। তবে ওগুলো বাষ্পের ইঞ্জিন নয়। বাষ্পের বদলে গরম হাওয়া ব্যবহার করা হয়।"

"তার মানে?"

"তার মানে এখানে রোদ্দুরের সাহায্যে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি করা হয় না। শুধু হাওয়াকে গরম করেই গরম হাওয়ার ইঞ্জিন চালানো হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কি জানো, জেম্‌স্ ওয়াট বাষ্পের ইঞ্জিন আবিষ্কার করার দশ দশটা বছর আগে হেনরি উড্ নামে এক ভদ্রলোক গরম হাওয়ার ইঞ্জিন তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তারপর ১৮০৭ সালে জর্জ কেলি প্রথম গরম হাওয়ার ইঞ্জিন তৈরি করেন। তবে গরম হাওয়ার ইঞ্জিনকে সত্যিকার কাজে লাগান স্কটল্যাণ্ডের এক যাজক—তাঁর নাম রবার্ট স্টারলিঙ। তিনি ১৮১৬ সালে তাঁর গরম হাওয়ার ইঞ্জিনটি চালু করেন। বহুকাল অবধি লোকে এই ইঞ্জিনটাকে স্টারলিঙের ইঞ্জিন নামেই চিনত। স্টারলিঙের পর এরিকসন বিশাল আকারের গরম হাওয়ার ইঞ্জিন তৈরি করেন। তিনশো অশ্ব ক্ষমতার একটা ইঞ্জিন তিনি 'এরিকসন' নামে একটা স্টীমারেও লাগিয়েছিলেন।"

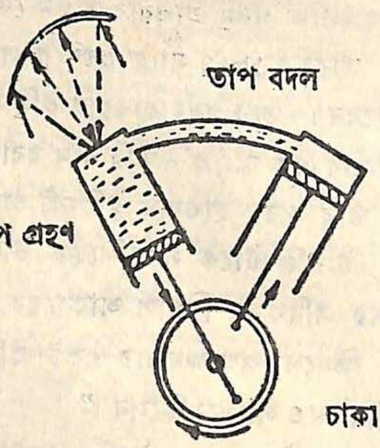
"এরিকসন নামে একজনের তৈরি একটা রোদ্দুরের ইঞ্জিনের ছবি দেখলাম না আমরা?" সৌতি প্রশ্ন করল।

"একই লোক। হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো। গরম হাওয়ার ইঞ্জিন মাত্রেই কিন্তু রোদ্দুরের ইঞ্জিন নয়। এতক্ষণ যেসব গরম হাওয়ার ইঞ্জিনের কথা বললাম, সেগুলো সবই চলতো কয়লা পোড়ানো তাপে। আর ঠিক এই কারণেই বাষ্পের ইঞ্জিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গরম হাওয়ার ইঞ্জিন হেরে গেছল। বাষ্পের ইঞ্জিন কয়লার তাপকে যতখানি কাজে লাগাতে পারত, গরম হাওয়ার ইঞ্জিন ততটা পারত না। গরম হাওয়ার ইঞ্জিনের কথা লোকে তাই প্রায় ভুলেই বসেছিল। সূর্য-শক্তির ব্যবহার শুরু হবার পর

আবার নতুন করে কদর বাড়ল গরম হাওয়ার ইঞ্জিনের। স্টারলিঙ ও এরিকসনের তুর্ভাগ্য যে তাঁরা একটু আগেভাগে জন্মেছিলেন।”

রাস্তার ধারে একটা প্রতিফলক উনুনে কেটলিতে জল গরম হচ্ছে দেখে কিরণদা বললেন, “চলো, রোদ্দুরের রেস্তোরাঁয় চা খাওয়া যাক। সেই সঙ্গে গরম হাওয়ার ইঞ্জিনের কথাটাও তোমাদের শোনা হয়ে যাবে।”

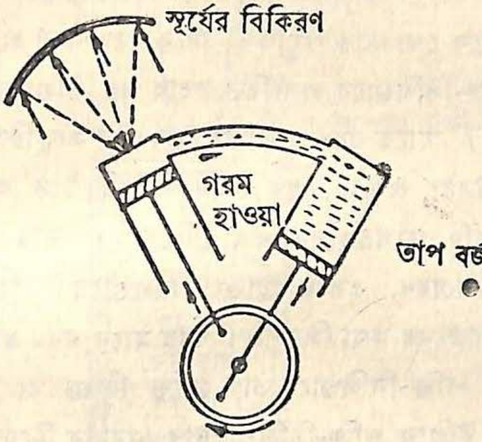
টেবিলে বসেই কাগজ পেন্সিল নিয়ে কিরণদা চটপট তুটো ছবি এঁকে ফেললেন। “ত্যাখো—এই হচ্ছে গরম হাওয়ার ইঞ্জিন।



গরম হাওয়ার ইঞ্জিনে হাওয়া গরম হচ্ছে

ইঞ্জিনের কার্য-পদ্ধতি বোঝাবার জন্যে একই ইঞ্জিনের তুটো অবস্থার ছবি এঁকেছি। প্রথম ছবিতে ত্যাখো, একটা অর্ধবৃত্তাকার প্রতিফলক সূর্যের আলোকে ইঞ্জিনের বাঁ দিকের সিলিণ্ডারের মাথায় জড় করছে। এই সিলিণ্ডারটাকে বলে হাওয়া-সিলিণ্ডার। হাওয়া-সিলিণ্ডারের মধ্যে থেকেই হাওয়া রোদ্দুরের তাপ সংগ্রহ করে। লক্ষ্য করে ত্যাখো হাওয়া-সিলিণ্ডারের পিস্টনটা রয়েছে একেবারে নীচের দিকে। হাওয়া-সিলিণ্ডারের ডান দিকে যে সিলিণ্ডারটা রয়েছে ওটার নাম শক্তি-সিলিণ্ডার। হাওয়া গরম হবার পর

আয়তনে প্রসারিত হয়। সেই প্রসারিত হাওয়া ওপরের নলটা দিয়ে ডান দিকের শক্তি-সিলিণ্ডারে প্রবেশ করে। এবার তোমরা পরের ছবিটা ছাখো।"



গরম হাওয়ার ইঞ্জিনে গরম হাওয়া শক্তি-সিলিণ্ডারে ঢুকে পিস্টনকে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে

সৌতি বলল, "গরম হাওয়াটা এবার পাশের সিলিণ্ডারে ঢুকে পিস্টনকে ঠেলে নীচে নামাচ্ছে দেখছি।"

"ঠিক বলেছ। লক্ষ্য করো, হাওয়া-সিলিণ্ডারের পিস্টনটা এবার ওপর দিকে উঠে এসেছে আর শক্তি-সিলিণ্ডারের পিস্টনটা নীচে নেমে গেছে। আসলে শক্তি-সিলিণ্ডারেই হাওয়ার তাপ ও চাপ থেকে আমরা যন্ত্রশক্তি পাই। পিস্টনটা ওপর-নীচ করে আর সঙ্গে সঙ্গে চাকাটা ঘোরে। এই চাকাটার সঙ্গেই আবার হাওয়া-সিলিণ্ডারের পিস্টনটা এমনভাবে লাগানো আছে যাতে ঠিক সময় মতো হাওয়াটা গিয়ে শক্তি সিলিণ্ডারের মধ্যে ঢুকতে পারে। তার মানে হাওয়া-সিলিণ্ডারের পিস্টনটার কাজ হচ্ছে শুধু এদিক ওদিক হাওয়া সরানো। আর শক্তি-সিলিণ্ডারের পিস্টনটার কাজ হচ্ছে গরম হাওয়া থেকে যন্ত্রশক্তি সংগ্রহ করা। বুঝলে তো?"

"এরপর পিস্টনটা আবার ওপরে উঠবে কি করে ?"

"শক্তি-সিলিণ্ডারে গরম হাওয়া যতখানি সম্ভব প্রসারিত হয় এবং সেই সঙ্গে পিস্টনটাকে ঠেলে নামিয়ে দেয়। এই কাজটি করে শেষ পর্যন্ত গরম হাওয়া দেখা যায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কারণ, শক্তি সিলিণ্ডারটাকে তো আর সূর্যকিরণ দিয়ে গরম করা হচ্ছে না। গরম হাওয়া শক্তি-সিলিণ্ডারে প্রসারিত হবার পর ঠাণ্ডা হয়ে আয়তনে কমে আসে। যাকে বলে সংকুচিত হয়। এই সংকুচিত হবার ফলেই শক্তি পিস্টনটা আবার সেই টানে ওপরে উঠে আসে। প্রথম ছবিটায় আমি তাপগ্রহণের কথা লিখেছি। তার মানে হাওয়া এখানে তাপগ্রহণ করছে হাওয়া-সিলিণ্ডারে। দ্বিতীয় ছবিটায় আমি তাপবর্জনের কথা লিখেছি। তার মানে গরম হাওয়া প্রসারিত হবার পর শক্তি-সিলিণ্ডারে তাপ ছেড়ে দিচ্ছে বা বর্জন করছে। সত্যিকার ইঞ্জিনে শক্তি-সিলিণ্ডারটার চারধার দিয়ে সারাক্ষণ জল পাঠানো হয় যাতে গরম হাওয়া সহজে ঠাণ্ডা হতে পারে। অনেক সময় আবার শক্তি-সিলিণ্ডারের বাইরের গায়ে চুড়ির মতো একের পর এক গোল গোল চেপটা চেপটা ধাতুর পাত আটকানো থাকে। এদের বলে কুলিঙ ফিন বা ঠাণ্ডা করার পাখনা। এগুলো বাইরের বাতাসের সাহায্যেই শক্তি সিলিণ্ডারকে ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে। গরম হাওয়ার ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে বুঝলে তো, এবার একটা সত্যিকার গরম হাওয়ার ইঞ্জিনের ছবি এঁকে দেখাচ্ছি।"

কিরণদা মাথা নীচু করে মুহূর্তের মধ্যে গরম হাওয়ার ইঞ্জিনের ছবি এঁকে ফেললেন।

সৌতি ছবিটা দেখে বলল, "এখানে দেখছি হাওয়ার সিলিণ্ডারটা রয়েছে শক্তি সিলিণ্ডারের মাথার ওপর। আচ্ছা, কোয়ার্তজ্-এর ঢাকনির ব্যাপারটা কি ?"

"বলছি। তার আগে একটা কথা বলে নিই। গরম হাওয়ার এই ইঞ্জিনে সূর্যের আলো দিয়ে হাওয়ার সিলিণ্ডারটাকে গরম করা



গরম হাওয়ায় ইঞ্জিন। ওপরকার হাওয়া সরাবার পিস্টনটাই আসলে কালো রঙের, লোহার জাফরিওলা। নীচের পিস্টনটা একেবারে নিরেট। কিরণদা ভুল করে নীচের পিস্টনটা কালো রঙের লোহার জাফরিওলা বলে লিখেছেন।

হয় না। গরম করা হয় গরম-হাওয়ার সিলিণ্ডারের ভেতরকার পিস্টনটা। লক্ষ্য করে ছাখো, এই পিস্টনটা কিন্তু নিরেট নয়। পিস্টনটা কালো রঙ করা আর লোহার জাফরি দিয়ে তৈরি। আকারেও বেশ মোটা-সোটা।"

"কিরণদা!" হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সুদেষ্ণা। "আপনি ভুল লিখেছেন। শক্তি সিলিণ্ডারের পিস্টনটাকে আপনি কালো রঙকরা, লোহার জাফরিওলা বলে লিখেছেন।"

"তাই তো! খুব ভুল হয়ে গেছে। তোমরা শুধরে নিও ভুলটা।"

"এই কালো পিস্টনটাই রোদ্দুরের তাপ গ্রহণ করে তেতে ওঠে, তাই না?" সৌতি প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ। সেইজন্যেই হাওয়ার সিলিণ্ডারের মাথায় কোয়ার্তজ্-এর একটা স্বচ্ছ টুপি বসানো আছে। কোয়ার্তজ্ এক বিশেষ ধরনের কাঁচ যা আকারে সাধারণ কাঁচের মতো চেপটা হলেও লেন্সের কাজ করে। সূর্য কিরণ প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত হয়ে এই কোয়ার্তজ্-এর ঢাকনি ফুঁড়ে সিলিণ্ডারের ভেতরে কালো পিস্টনের ওপর জড়ো হয়। ঢাকনিটা না থাকলে পিস্টন এতটা তাপ পেত না। এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে। হাওয়া-সরাবার পিস্টনের লোহার জাফরির ফাঁকে ফোঁকরে ঢুকে পড়ে হাওয়া এখানে খুব তাড়াতাড়ি তেতে ওঠার সুযোগ পায়।"

"কিরণদা, ছবির নীচে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট বলে ওটা কি লিখেছেন?" সুদেষ্ণা জিজ্ঞেস করল।

"ভাল প্রশ্ন করেছ। গরম হাওয়ার ইঞ্জিন, বাষ্পের ইঞ্জিন, মটর গাড়ির পেট্রলের ইঞ্জিন বা লরীর ডিজেলের ইঞ্জিন—যেখানেই পিস্টন সিলিণ্ডার ব্যবহার করে যন্ত্রশক্তি উৎপন্ন করা হয় সেখানেই ক্র্যাঙ্কশ্যাফট থাকবে। আসলে পিস্টনটা শুধু ওপর-নীচে ওঠা-নামা করে। এই ওঠা-নামা দিয়ে আমাদের কাজ হয় না। আমরা চাই চাকা ঘোরাতে। পিস্টনের ওঠা-নামাকে চক্রাকার গতিতে

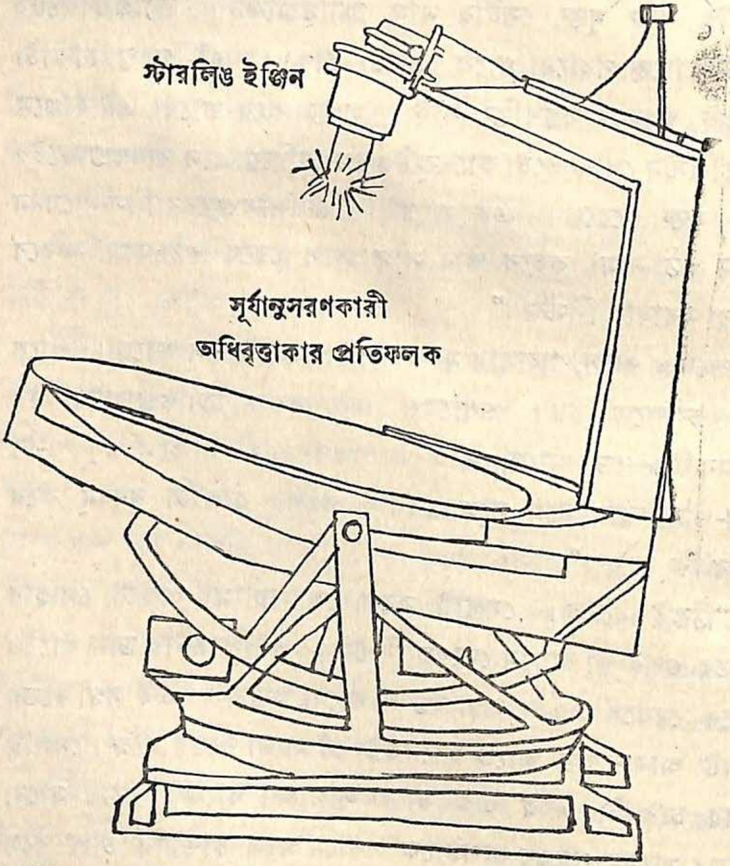
পরিবর্তন করার জন্যে দরকার হয় কানেক্‌টিঙ রড আর ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। পিস্টন থেকে যে লম্বা রডটা নীচের দিকে নেমে গেছে, ওটাকে বলে কানেক্‌টিঙ রড, আর ক্যানেক্‌টিঙ রডটা যে আঁকাবাঁকা লোহার রডটার সঙ্গে যুক্ত, সেটার নাম ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের একটা প্রান্তে পরানো থাকে একটা চাকা। এই ঘুরন্ত চাকাটা থেকেই আমরা যন্ত্রশক্তি পাই। লক্ষ্য করে ছাখো, এই ইঞ্জিনে দুটো পিস্টন থেকে দুটো কানেক্‌টিঙ রড বেরিয়ে এসে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই জন্যেই শক্তি সিলিণ্ডারের পিস্টন যেমন যেমন ওঠা-নামা করবে তার সঙ্গে তাল রেখে ওঠা-নামা করবে হাওয়া সরাবার পিস্টন।"

সুদেষ্ণা বলল, "আমার মা-র একটা সেলাই কল আছে। পায়ে করে চালাতে হয়। ওখানেও এই রকম ক্র্যাঙ্কশ্যাফট আর কানেক্‌টিঙ রড আছে, তাই না কিরণদা? না হলে শুধু পা-টা নামা-ওঠা করার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই কলের চাকাটা বন্‌বন্‌ করে ঘোরে কি করে?"

"ঠিকই ধরেছ। সেলাই কলে তোমার মা একটা লোহার পাতের ওপর পা রাখেন দেখেছ নিশ্চয়? এই পাতটার ডান ধারের কোণে দেখবে একটা লম্বা রড লাগানো আছে। এই লম্বা রডের মাথাটা আবার যুক্ত আছে আরেকটা বেঁকানো রডের সঙ্গে। সেলাই কলের চাকাটা এরই এক ধারে লাগানো থাকে। তার মানে, তোমার মায়ের পায়ের চাপটাকে এখানে গরম হাওয়ার চাপ বলে মনে করতে পারো আর ওই পা রাখার লোহার পাতটা হল পিস্টন একই ভাবে লোহার পাতটার সঙ্গে যুক্ত লম্বা ডাণ্ডাটা হল কানেক্‌টিঙ রড আর সেলাই কলের চাকাটা যে-বেঁকানো রডটার একধারে পরানো আছে, ওটা হল ক্র্যাঙ্কশ্যাফট।"

গরম হাওয়ার ইঞ্জিনের রহস্যভেদ করে চায়ের কাপে একটা চুমুক লাগিয়েই আবার কাগজ পেন্সিল টেনে নিলেন কিরণদা।

রোদ্দুরের স্টারলিঙ ইঞ্জিন



রোদ্দুরের স্টারলিঙ ইঞ্জিন সৌরশক্তিতে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিবর্তিত করে

ছবি আঁকা শেষ হলে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে কিরণদা বললেন, "এই ইঞ্জিনটাও গরম হাওয়ার ইঞ্জিনেরই মতো। তবে এর মধ্যে হাওয়ার বদলে একটা গ্যাস ব্যবহার করা হয়। হয় হিলিয়াম নয়তো হাইড্রোজেন। হাওয়ার তুলনায় হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম অনেক চটপট সূর্য-কিরণ থেকে তাপ টেনে তেতে ওঠে এবং তাপ-শক্তিকে

আরো ভালভাবে কাজে লাগানো যায়। হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন ছাড়া পারদ বাষ্প ব্যবহার করেও এই ধরনের স্টারলিঙ ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছে। তবে এগুলো সাধারণতঃ মহাকাশে ব্যবহার করা হয়। মহাকাশ যানে, চাঁদের পিঠে, মহাকাশ গবেষণাগারে বা মহাকাশের স্টেশনে এরকম ইঞ্জিন সর্বত্রই দেখা যায়।"

"মহাকাশে রোদ্দুরের ইঞ্জিন! আচ্ছা কিরণদা, এই ধরনের ইঞ্জিনের তো একটা করে প্রতিফলক লাগবেই। আপনি তো এই ইঞ্জিনটারও একটা প্রতিফলক এঁকেছেন দেখছি। দেখেই মনে হচ্ছে সূর্যমুখী প্রতিফলক। এত বড় বড় প্রতিফলক শুদ্ধু মহাকাশে রোদ্দুরের ইঞ্জিন পাঠানো হয় কি করে?" সৌতি ভুরু কুঁচকে একটা জোরালো প্রশ্ন করেছে।

"বড় বড় প্রতিফলক শুদ্ধু ইঞ্জিন পাঠানো হয় না। প্রতিফলক-গুলোকে পাট করে মুড়ে ফেলার পর মহাকাশে পাঠানো হয়। মহাকাশে পেঁৗছে সেগুলো ছাতার মতো খুলে যায়। আপনা হতেই খুলে যাবার মতো ব্যবস্থা থাকে।"

"কিন্তু আয়না বা ধাতুর পাতকে ছাতার মতো মোড়ে কি করে? ছাতা তো তৈরি হয় নরম কাপড় দিয়ে…"

"প্রতিফলকও এখন কাপড়ের মতোই নরম এক ধরনের প্ল্যাস্টিক জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি হচ্ছে। এগুলো ধাতুর চেয়ে অনেক হালকা আবার ধাতুর বা আয়নায় মতোই ঝকঝকে। আয়না বা ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি প্রতিফলকের যা ওজন অত ভারী জিনিসকে মহাশূন্যে পাঠানো খুব মুস্কিল। প্রচুর ঝামেলার ও মেলাই খরচের ব্যাপার। মহাকাশে রাত বলে কিছু নেই তাই এই ধরনের ইঞ্জিন মহাকাশে চব্বিশ ঘণ্টাই একটানা চলতে পারে। এটা একটা বিরাট সুবিধে।"

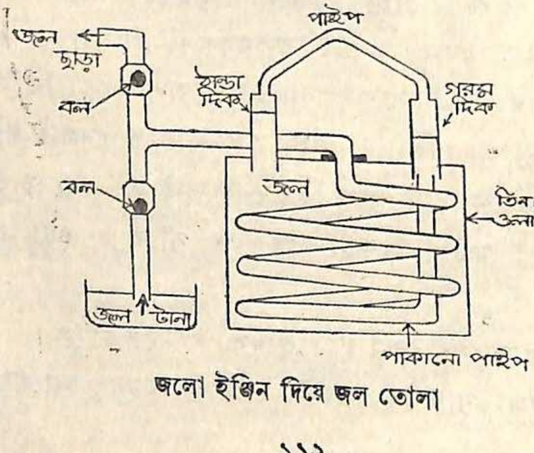
"মহাকাশে রাত নেই কেন?" সুদেষ্ণা জানতে চাইল।

"সূর্যের আলো পৃথিবীর একটা পিঠকে যখন আলোকিত

করে তখন তার উল্টোপিঠটা থাকে অন্ধকার হয়ে। পৃথিবীর শরীরটাই সূর্যের আলোকে বাধা দেয়। মহাশূন্যে কিন্তু কোন গ্রহ উপগ্রহের কাছাকাছি ছায়ার আওতায় না পড়লে সব সময়েই রোদ পাওয়া যায়। হ্যাঁ ভাল কথা, এই যে স্টারলিঙের ইঞ্জিনের ছবিটা এঁকেছি এর আরেকটা বৈশিষ্ট আছে। এর মধ্যে পিস্টনের ওঠা-নামাকে ক্র্যাঙ্কশ্যাকটের মাধ্যমে চাকা ঘোরাবার কাজে লাগানো হচ্ছে না। এখানে পিস্টনটা একটা চুম্বক আর সিলিণ্ডারটা হচ্ছে গায়ে তার-জড়ানো কাঁচা লোহা। একটা চুম্বক তারের কুণ্ডলীর মধ্যে নড়াচড়া করলে তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এই পদ্ধতিতেই তৈরি হয় ইলেকট্রিক মেশিন বা জেনারেটার। সাধারণতঃ জেনারেটারে চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এই স্টারলিঙ ইঞ্জিনে কিন্তু চাকা ঘোরাতে হয় না। সেইটাই সবচেয়ে বড় সুবিধে। এতে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি হয়।"

জলো ইঞ্জিন

হঠাৎ দোকানদার ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে এই! তোরা কি কিছু দেখবি না? ট্যাঙ্কে জল নেই যে। দে' দে' জলো ইঞ্জিনটা চালিয়ে দে'!"



জলো ইঞ্জিন দিয়ে জল তোলা

জলো ইঞ্জিন? সেটা আবার কি পদার্থ? সৌতি কিরণদার মুখের দিকে তাকালো।

“চা খাওয়া হয়ে গেছে তো? চলো তাহলে, জলো ইঞ্জিনটা দেখে আসি। খুব মজা লাগবে।” কিরণদার সঙ্গে চায়ের দোকানের পিছনে একফালি খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা।

জলভরা বিরাট একটা কাঁচের পাত্র বসানো রয়েছে জমির ওপর। পাত্রটার তিনটে মুখের একটা মুখকে গরম করছে বিরাট একটা প্রতিফলক। এই গরম মুখটার ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে আরেকটা মুখ। কিরণদা জানালেন, এটা হচ্ছে ঠাণ্ডা মুখ। গরম মুখ আর ঠাণ্ডা মুখটা একটা বেঁকানো পাইপ দিয়ে যোগ করা আছে। পাত্রের মাঝখানের তৃতীয় মুখটা থেকে বেরিয়ে এসেছে আরেকটা পাইপ। এই পাইপটারই একটা দিক গেছে মাটির তলায় টিউবওয়েলের মধ্যে। আর তার ওপর দিকটা থেকে ছড়ছড় করে জল পড়ছে। ট্যাঙ্ক ভর্তি হচ্ছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল পাত্রের মধ্যে জলটা স্থির হয়ে নেই। ঠাণ্ডা ও গরম মুখের মধ্যে ধক্ ধক্ করে কেবলই ওঠানামা করছে।

কিরণদা বললেন, “দেখছো তো, জলো ইঞ্জিনে জলের পিস্টন কেমন নড়াচড়া করছে?”

“জলের পিস্টন?”

“হ্যাঁ। জলটাই এখানে পিস্টনের কাজ করছে। পাত্রের গরম দিকটা তেতে উঠলে ভেতরকার হাওয়া বা বাষ্পটাও গরম হয়ে ফুলে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই চাপে জলটা ঠেলা মারছে পাত্রের ভেতরে রাখা প্যাঁচানো পাইপের খোলা মুখটায়। পাত্রের মাঝের মুখটা দিয়ে এই পাইপটা বেরিয়ে এসেছে। এদিকে ঠাণ্ডা মুখ থেকে পাইপ দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গরম দিকের হাওয়াটাকে আবার জুড়িয়ে দিচ্ছে। তখন ভেতরের হাওয়া সংকুচিত হচ্ছে। এইভাবে হাওয়া একবার প্রসারিত হচ্ছে আর পরক্ষণেই সংকুচিত হচ্ছে

আর সঙ্গে সঙ্গে জলের পিস্টনটাও ওঠানামা করছে। এবার বাঁ দিকের পাইপটার মধ্যে দেখো, দুটো বল রাখা আছে। একটা ওপরে একটা নীচে। ওপরের বলটা ঠেলা খেলে ওপর দিকে উঠে পথ ছাড়ে আর নীচের বলটাকে টেনে ধরলে তবে পথ ছাড়ে। তার মানে হচ্ছে এই বল দুটো জলকে কখনো নীচে পালাতে দেয়না। জল একমাত্র নীচের থেকে ওপর দিকে উঠতে পারে। জলের পিস্টনটা গরম হাওয়ার চাপে ঠেলে উঠলে সেই চাপে নীচের বলটা নীচেই থাকে, শুধু ওপরের বলটা ফাঁক হয়ে জলকে উঁচুতে ঠেলে দেয়। আবার হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে সংকুচিত হলে জলের পিস্টন যখন নীচে নামে তখন সেই টানে নীচের বলটা ফাঁক হয়ে নীচের থেকে জল টেনে নেয় কিন্তু ওপরের বলটা ফাঁকও হয় না, ওপরের জলকে নীচে নামতেও দেওনা। এই বলগুলো আসলে কলের কাজ করে। একে বলে, ওয়ান্-ওয়ে-ভাল্ভ্। মানে এক মুখী কল। জলকে শুধু একদিকে যেতে দেয়। এইভাবেই নীচের জলকে ওপরে তুলে দিচ্ছে জলো ইঞ্জিনের জলতোলা কল। এই পাম্পগুলো খুব সস্তা। ছোটখাটো কাজের পক্ষে খুব ভাল। একই ধরনের কিন্তু বড় আকারের জলো ইঞ্জিনের মধ্যে আবার হাওয়ার বদলে পেন্‌টেন্ নামে এক ধরনের বাষ্প ব্যবহার করা হয়। তাতে পাম্পের ক্ষমতা আরো বাড়ে।”

"ট্যাক্সি!" কিরণদা হাত দেখিয়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্সের মতো গাড়ি থামালেন। আজব দেশের আজব গাড়ি। সাদা রঙের গাড়িটার মাথায় লাগানো রয়েছে একটা মৌমাছির চাকের মতো খোপ কাটা-কাটা চেপটা কাঁচের বাক্স। গাড়িটার চাকাগুলো স্কুটারের চাকার চেয়ে বড় নয়। মুখটা আবার থ্যাবড়া। চার-জনের বেশী বোধহয় বসতে পারবে না।

সৌতি আর সুদেষ্ণাকে পেছনের সীটে বসিয়ে কিরণদা উঠে বসলেন ড্রাইভারের পাশে। কিরণদা কি যেন বলতেই গাড়ি চলতে শুরু করে দিল। আশ্চর্য, গাড়ি চলছে কিন্তু কোন শব্দ নেই, একটু ঝাঁকুনি নেই। যেন জলের মতো অনায়াসে গড়িয়ে চলেছে।

"কি রকম লাগছে বলতো আমাদের গাড়ি?" কিরণদা জিজ্ঞেস করলেন।

"একদম অন্য রকম কিরণদা।" সুদেষ্ণা বলল। "ডবল ডেকার বাসে কি আওয়াজ হয়। ভীষণ ঝাঁকুনি দেয়—"

সৌতি প্রশ্ন করল, "এ গাড়িটাও কি সূর্যের আলোয় চলছে কিরণদা?"

"নিশ্চয়। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ গাড়ি সূর্যের আলোয় চলে। আর কিছু চলে—থাক, সেকথা পরে বলব।"

"রোদ্দুর দিয়ে কি করে গাড়ি চলছে কিরণদা?" সৌতি আবার প্রশ্ন করল।

"তোমাদের আমি আগেই দেখিয়েছি, টিভি, রেডিও ও রেকর্ড প্লেয়ার কিভাবে সৌর ব্যাটারি দিয়ে চালানো হয়। ঠিক একই পদ্ধতিতে চলছে এই গাড়িটা। এটাতে পেট্রল বা ডিজেলের

ইঞ্জিন নেই। আছে একটা বৈদ্যুতিক মোটর। এই মোটরটা চালাতে যে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় সেটা আসে একটা বড় ব্যাটারি থেকে। এই ব্যাটারিটা দিনের বেলায় কতকগুলো সোলার সেল বা সৌর ব্যাটারির সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করে রাখে। ওই যে গাড়ির মাথায় দেখছো—খুপরি কাটা কাটা কতকগুলো কাঁচের জিনিস, ওইগুলোকেই বলে সোলার সেল। সোলার সেলে সূর্যের আলো পড়লেই তার থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেই বিদ্যুৎ দিয়ে এই গাড়ির মূল ব্যাটারিটাকে চাঙ্গা করে রাখা হয়। কারণ রাত্তির বেলায় তো আর আলো থাকবে না, সোলার সেলও বিদ্যুৎ দেবেনা —সেই সময় মূল ব্যাটারির মধ্যে সঞ্চিত শক্তিটা খরচ করেই গাড়ি চলবে।"

"সোলার সেলটা কি দিয়ে তৈরি হয় কিরণদা?" সৌতি প্রশ্ন করল।

"সোলার সেলে আলো পড়লে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় কেন?" একই সঙ্গে সুদেষ্ণাও জানতে চাইল।

"তোমাদের যখন সোলার সেল তৈরির কারখানায় নিয়ে যাবো তখন ভাল করে সব দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দেবো। তবে এটুকু বলে রাখছি—এও অনেকটা তোমাদের টর্চের ব্যাটারিরই মতো। ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সেটা তোমরা সবাই জানো। কিন্তু কি করে পাওয়া যায় বলতে পারো কি?"

"ব্যাটারির মধ্যে একটা বিশেষ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটে বলে বিদ্যুৎ তৈরি হয়।" সৌতি বলল।

"ঠিক বলেছ। সোলার সেলেও এমনি প্রতিক্রিয়া ঘটে। তবে এখানে সেই প্রতিক্রিয়া ঘটায় সূর্য-রশ্মি। যে-কোন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া থেকে যেমন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় না, তেমনি সোলার সেলের বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। বিশেষ কয়েকটা পদার্থ শুধু সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুতের জন্ম দিতে পারে। এই রকম

একটা ধাতু হল সেলেনিয়াম। শুধু সেলেনিয়ামে অবশ্য কাজ হবে না। তার সঙ্গে একটা লোহার পাতও চাই। এই—গাড়িটা একবার দাঁড় করাও তো।”

যেমন নিঃশব্দে যাচ্ছিল গাড়িটা তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল।

“সৌর বাটারির কথা জানার আগে আমরা বরং সৌর-ব্যাটারির দাদা তাপ-ব্যাটারির বা তাপকোষের কথাটা জেনে নিই। আসলে সৌর-ব্যাটারির আবিষ্কারের আগে তাপ-ব্যাটারি আবিষ্কার হয়েছিল। সেইজন্যেই তাপ ব্যাটারিকে সৌর ব্যাটারির দাদা বলছি।”

তাপ থেকে বিদ্যুৎ

গাড়ি থেকে নেমে সৌতি আর সুদেষ্ণাকে নিয়ে এগিয়ে চললেন কিরণদা। তাপ থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি হয় সামনের কারখানাটার মধ্যে। এখান থেকেই কারখানার সাইন বোর্ডটা পড়া যাচ্ছে—"তাপকোষ মহাকেন্দ্র।"

কিরণদা হাঁটতে হাঁটতেও কথা থামাননি, "তোমরা জানো গাছপালা পাতার সাহায্যে সৌরশক্তির একশো ভাগের একভাগ মাত্র সঞ্চয় করে। এমনিতে ব্যাপারটা খুবই সামান্য মনে হলেও এই সামান্য সঞ্চয়েরই সামান্য একটা অংশ কয়লা ও তেল হিসেবে মাটির তলায় জমা ছিল। আমাদের যন্ত্রযুগের প্রায় সমস্ত শক্তির চাহিদা পূরণ করেছে এই কয়লা বা তেল। জ্বালানী হিসেবে আদিম মানুষকেও সেই কাঠের ওপর বা শুকনো পাতার ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল। মানুষ প্রথম থেকেই শক্তির জন্য সূর্যের ওপর নির্ভর করেছে কিন্তু তার জন্যে দরকার ছিল গাছেদের সাহায্য। মানুষ যখন গাছেদের বাদ দিয়ে সরাসরি সূর্যের তাপ ও আলোকে শক্তি হিসেবে প্রয়োজন মতো সঞ্চয় করতে ও ব্যবহার করতে আরম্ভ করল, শুরু হল এক নতুন যুগ। এতদিন পর্যন্ত সূর্যের আলো একমাত্র সঞ্চিত হত গাছে (পাতার ক্লোরোফিলের সাহায্যে)। সেই সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তিকে আদিম মানুষ তাপশক্তিতে পরিণত করেছিল আগুন জ্বেলে। তারপর কয়েক হাজার বছর পর মানুষ তৈরি করল বাষ্পের ইঞ্জিন। এই প্রথম তাপশক্তিকে (কয়লা পুড়িয়ে সেই তাপে জল ফুটিয়ে) যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করল মানুষ। বন্‌বন্ করে ঘুরতে শুরু করল যন্ত্রের চাকা। একের পর এক গজিয়ে উঠল কলকারখানা। হাজারো রকমের জিনিসপত্র

তৈরি হতে শুরু হল বিপুল সংখ্যায়। যন্ত্রযুগের সূচনা হল। তারপর যন্ত্রশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব হতেই সূচনা হল আরেক নতুন যুগের—বিদ্যুৎ শক্তির যুগ। তার মানে পাতার ভাঁড়ারে সঞ্চিত সূর্যশক্তি ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে বিজলী আলো জ্বালল। কিন্তু শক্তির এই রূপ পরিবর্তন করার সময় প্রত্যেক বারই বেশ কিছুটা করে শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সূর্যশক্তিকে সরাসরি কাজে লাগাতে না পারলে এই অপচয় বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তার জন্যে মানুষকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। অনেক বিজ্ঞানীর অনেক গবেষণার পর আজ আমরা সেই আশ্চর্য জিনিস তৈরি করেছি যার ওপর আলো পড়লেই বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তবে আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি করতে শেখার আগেই আমরা তাপ থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি করতে শিখেছিলাম।”

তাপকোষ মহাকেন্দ্রের অফিস বাড়িটার বারান্দায় পা দিতেই প্রথমেই ওদের চোখে পড়ল একটা কেরাসিনের বাতির বাবুইবাসার মতো কাঁচের চিম্‌নির গায়ে একটা পাখনাওলা ধাতুর বালা পরানো আছে। আর সেই বালাটা থেকে দুটো তার বেরিয়ে এসেছে। বাতিটা জ্বেলে সুইচ টিপে দিলেই রেডিও বাজতে শুরু করছে। কিন্তু বাতি নিবিয়ে দিলেই রেডিও বন্ধ। তার মানে বাতিটা জ্বললেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে।

কিরণদা বললেন, “দুটি ভিন্ন ধাতুকে যুক্ত করে তার একটা দিক যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে তার গরম দিক আর ঠাণ্ডা দিকের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। এই ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক সীবেক্ প্রথম আবিষ্কার করেন ১৮২১ সালে। তোমরা নিজেরাও ছোট্ট একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো। একটা ইস্পাতের আর একটা তামার তার নিয়ে তার দুটো গায়ে গায়ে পেঁচিয়ে নাও। দুটো সুতোকে এক সঙ্গে জড়াবার মতো। এবার তামার তারটাকে মাঝখান থেকে ছিঁড়ে ফেলো। ছেঁড়া তারের দুটো মুখ গ্যালভানোমিটার যন্ত্রের গায়ে

লাগানো ছুটো লোহার মুণ্ডিতে আলাদা আলাদা ভাবে আটকে দাও।"

"গ্যালভানোমিটার কি কিরণদা?"

"গ্যালভানোমিটার একটা যন্ত্র। যন্ত্রটাকে কোন তারের সঙ্গে জুড়ে সেই তার দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালেই যন্ত্রের কাঁটাটা চড়াঙ করে নড়ে ওঠে। তার মানে তারের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে কিনা বা বিদ্যুতের জোর কতখানি সেটা এই যন্ত্রটার কাঁটা দেখে বোঝা যায়। যা বলছিলাম, গ্যালভানোমিটারটা জুড়ে দিলে তো, এবার ইস্পাত আর তামার তারের একটা মুখকে বরফগলা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও আর অন্যদিকটা ধরো আগুনের শিখায়। দেখবে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের কাঁটাটা নড়ে উঠবে। তার মানে তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছে। আগুনের শিখা বা বরফের প্রয়োজন হচ্ছে এই তারের কুণ্ডলীর একটা দিক গরম ও অন্য দিকটা ঠাণ্ডা রাখার জন্যে। ঠাণ্ডা গরমের মধ্যে উষ্ণতার যত বেশী পার্থক্য হবে তত বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। ইস্পাত ও তামার বদলে দস্তা ও অ্যান্টিমনির একটা তারকে লেড সালফাইড বা গ্যালেনার একটা তারের গায়ে পেঁচিয়ে নিলেও একই ফল পাওয়া যাবে। বৈজ্ঞানিক সীবেকের এই আবিষ্কার নিয়ে বহুকাল কিন্তু লোকে আদৌ মাথাই ঘামায়নি। বুঝতেও পারেনি যে এই ব্যাপারটাকে কোনো কাজে লাগানো যাবে কিনা। তাছাড়া তখন অবধি এমন ধাতুরও সন্ধান পাওয়া যায়নি যা ব্যবহার করে তাপশক্তির একশো ভাগের এক ভাগকেও বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিবর্তিত করা যায়। শেষ পর্যন্ত টেলুরিয়াম ধাতুর কতকগুলো যৌগিক আবিষ্কার হতে তাপশক্তির একশো ভাগের ন'ভাগকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হল। এই কেরাসিনের তাপকোষটার গরম প্রান্তের উষ্ণতা ৩৮০° সেন্টিগ্রেড আর ঠাণ্ডা দিকের উষ্ণতা ৬০° সেন্টিগ্রেড থেকে ৮০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে আছে। তাপ-কোষের একটা প্রান্তকে ঠাণ্ডা করার জন্যেই পাখনা লাগানো বালাটা

পরানো হয়। এটা দিয়ে প্রায় ৪০০০ ঘণ্টা একটা ডি-সি (ডাইরেক্ট কারেন্ট) রেডিও বাজানো যায়। ১৯৬০ সালে প্রথম এই ধরনের অনেক তাপকোষ তৈরি হয়েছিল সোভিয়েত দেশে। ওরা এর নাম দিয়েছিল 'স্পুটনিক ল্যাম্প'। অবশ্য তাপকোষ-এর ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয়েছে 'প্লাজমিক' তাপকোষ আবিষ্কার হবার পর। 'প্লাজমিক তাপকোষ' কোন কঠিন বস্তু নয়—এটা হচ্ছে আয়ন আর ইলেকট্রনের গ্যাসীয় মিশ্রণ। প্লাজমিক তাপকোষের বৈশিষ্ট কি জানো? খুব উচ্চ তাপমাত্রায় এটা টেলুরিয়ামের চেয়ে ভাল কাজ করে। ফলে এখন আমরা অনেক জায়গায় প্লাজমিক তাপকোষ আর টেলুরিয়াম তাপকোষ এক সঙ্গে ব্যবহার করছি।"

সুদেষ্ণা এবার জানতে চাইল, "আচ্ছা কিরণদা, তাপকোষ থেকে বিদ্যুৎ পেতে গেলেও তো তাপ চাই। সেই তাপটা তো…"

"বাঃ—বেশ বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করেছ তো। হ্যাঁ, তাপকোষের জন্যে তাপ চাই। প্রশ্নটা করেইছো যখন বলি, তাপকোষের সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যবহার কোথায় হয়েছে জানো? আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে।"

"আগ্নেয়গিরি?" দু'জনেই চমকে গিয়ে একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ—যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ করার কোন উপায় নেই আমরা তাদের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি বিশাল সব তাপকোষ। যে-তাপ এমনিতে নষ্টই হয়ে যেত সেটাকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগাচ্ছি।"

"কী সাংঘাতিক কাণ্ড!" সুদেষ্ণা বলল।

"আগ্নেয়গিরি ছাড়াও তাপকোষের আরেকটা ব্যবহার হচ্ছে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে।" কিরণদা বললেন। "তোমরা জানো, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পারমাণবিক জ্বালানী থেকে তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপ দিয়ে বয়লারে জল ফোটানো হয় ও বাষ্প তৈরি হয়। সেই বাষ্পের তাপে ও চাপে টারবাইনের চাকা ও তারপর

জেনারেটার ঘুরিয়ে তৈরি হয় বিদ্যুৎ, তাই না? এখন কিন্তু এত সব কাণ্ড করার কোন দরকারই হয় না। পারমাণবিক জ্বালানীর ডাণ্ডাগুলো থাকে তাপকোষের মধ্যে ঢোকানো। পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপশক্তি সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। চলো, তোমাদের একটা তাপকোষ বিদ্যুৎকেন্দ্র দেখিয়ে আনি।"

রোদ্দরের গাড়িতে চড়ে সুদেষ্ণা আর সৌতি এসে পৌঁছল তাপকোষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। কালো চশমা পরেও চোখ চেয়ে তাকাতে কষ্ট হয়। বিরাট একটা মাঠ জুড়ে অসংখ্য ঝকঝকে ফুল ফুটে রয়েছে। আসলে এগুলো ফুল নয়। কানা উঁচু থালার মতো এক-একটা আয়না। আয়না ফুলের মাঝখান থেকে পুং কেশরের শুঁড়ের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে তাপকোষ। সূর্যের আলো এই অবতল আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়ছে তাপকোষের ওপর।

কিরণদা বললেন, "তাপকোষের ওপর সূর্যের তাপ জড়ো করে বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে। প্রত্যেকটা তাপকোষের গরম দিকটার তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।"

"আর ঠাণ্ডা দিকটা?" সুদেষ্ণা জানতে চাইল।

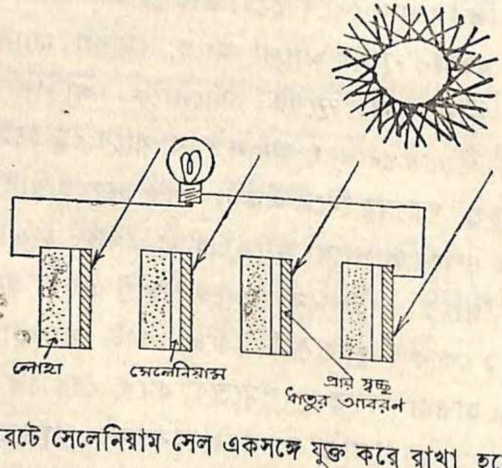
"চল্লিশ ডিগ্রির মতো। একটা বিশেষ ধরনের তরল ঠাণ্ডা দিকের তাপমাত্রটাকে এর বেশী উঠতে দেয় না।"

তাপকোষ কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আবার রোদ্দুরের গাড়িতে চড়ে বসল সবাই। এবার তারা সৌর ব্যাটারি তৈরির কারখানা দেখতে চলেছে। রোদ্দুর থেকে বিদ্যুৎ তৈরির কারসাজি দেখতে। সৌর ব্যাটারির অনেক ব্যবহার এর মধ্যেই ওরা দেখে ফেলেছে, কাজেই উৎসাহটা যে বেশ চনমন করে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি। তার ওপর কিরণদা আবার যেসব গল্প শোনাচ্ছেন, আষাঢ়ে গল্প বলে মনে করে নিতে পারলেই ভাল হত। অনেক বাড়ির জানলার কাঁচের ওপর লাগানো আছে গোল বা চৌকো আকারের অনেক চাকতি। চাকতির পেছন থেকে দুটো তার বেরিয়ে এসেছে টেবিল ফ্যান অবধি। যতক্ষণ সূর্যের আলো আছে, টেবিল ফ্যান বনবন করে ঘুরছে। কিন্তু যেই সূর্যের আলোকে আড়াল করবে, জানলার ওপর পড়তে দেবেনা, অমনি পাখা যাবে বন্ধ হয়ে। শুধু কি তাই? প্রচণ্ড গরমের দিনে একটা লোক চলেছে মাথায় ছাতা দিয়ে। ছাতার ওপরে লাগানো আছে গোল গোল চাকতি আর ছাতার বাঁটের গায়ে আটকানো আছে ছোট্ট একটা ইলেকট্রিক পাখা। রোদ্দুর থেকে বিদ্যুত তৈরি হচ্ছে আর লোকটা হাঁটতে হাঁটতেই পাখার হাওয়া খাচ্ছে। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলেও চারধারে চোখে পড়বে চাকতি লাগানো বর্ষাতির কাপড়ের তাঁবু আর তার সঙ্গে রান্নার জন্য বৈদ্যুতিক উনুন, বিজলী আলো বা ফ্যানের ব্যবস্থা। এইসব কাণ্ডকারখানার নায়ক ওই গোল বা চৌকো চাকতিগুলো। মানে সৌর ব্যাটারি। রোদ্দুর থেকে বিদ্যুত তৈরি করে যেন ম্যাজিক দেখাচ্ছে।

কিরণদার গল্প শুনতে শুনতেই "সৌর ব্যাটারি নির্মাণ কেন্দ্র"-র

সামনে এসে পড়ল ওরা। গাড়ি থেকে নেমে কিরণদা বললেন, "কারখানার ভেতরে আমাদের না ঢুকলেও চলবে। বাইরেই শো-কেসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সৌর ব্যাটারির নমুনা সাজানো আছে। কারখানার ভেতরে ঢুকে বিশেষ কিছু বোঝা যাবেনা। বিশাল সব স্বয়ংক্রিয় মেশিন। কোথা থেকে কি হয়ে যাচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে বুঝে ওঠা মুস্কিল।"

শো-কেসের প্রথম তাকটার সামনে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—"সেলেনিয়াম সৌর ব্যাটারি"। তার নীচেই একটা সেলেনিয়াম সৌর ব্যাটারির মডেল। কিরণদা বললেন, "ব্যাটারিগুলো খুব ছোট বলে এখানে বড় আকারের মডেল তৈরি করে রাখা হয়েছে লোকের বোঝবার সুবিধের জন্য।"



চারটে সেলেনিয়াম সেল একসঙ্গে যুক্ত করে রাখা হয়েছে।
তার ওপরে রোদ্দুর পড়ে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ
আর বিজলী আলো জ্বলছে।

শো-কেসে সেলেনিয়ামের ব্যাটারির পাশেই একজন ভদ্রলোকের ছবি রয়েছে। নাম উইলাওবি স্মিথ। ১৮৭৩ সালে তিনি নাকি প্রথম সেলেনিয়াম ধাতু ব্যবহার করেন জলের তলা দিয়ে

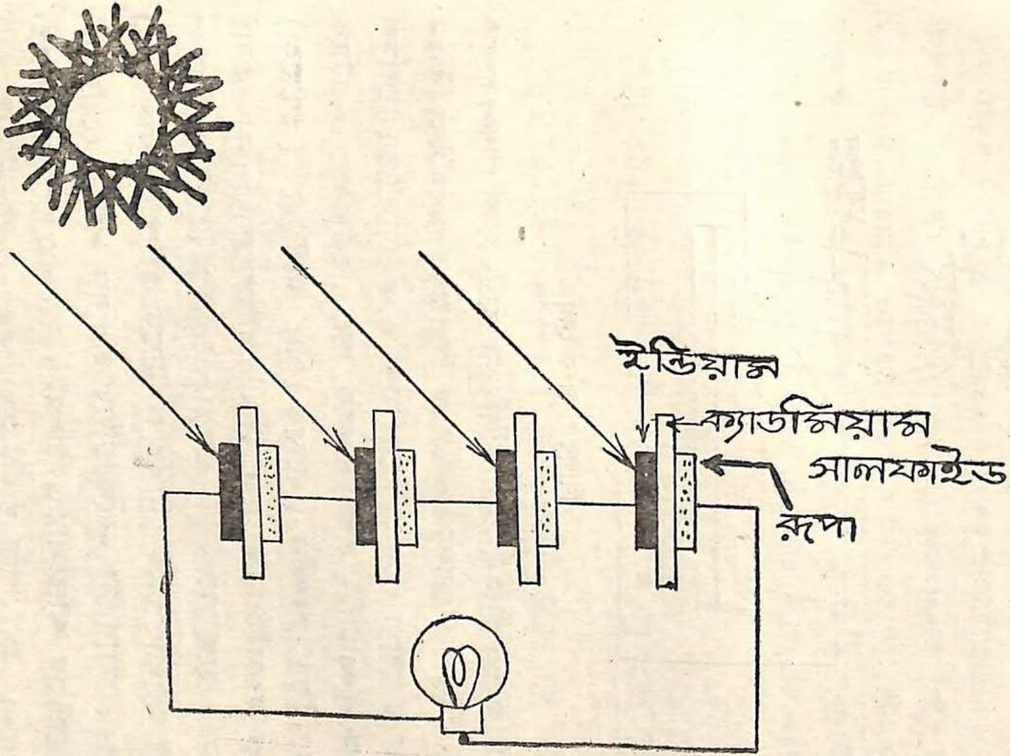
টেলিগ্রাফ সঙ্কেত পাঠাবার জন্য। তারপর থেকে বহু বিজ্ঞানী সেলেনিয়াম নিয়ে গবেষণা করেছেন। এক সময় "ফটোফোন" নামে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছিল যা গ্রামোফোন রেকর্ডের শব্দকে আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাত। "ফটোফোন" যন্ত্রের একটা ছবিও রয়েছে শো-কেসে। গ্রামোফোনের পিনের সঙ্গে আটকানো ছোট্ট একটা আয়নার ওপর আলো এসে পড়ছে। রেকর্ড চলার সঙ্গে সঙ্গে পিনটা নড়াচড়া করছে এবং আলোর প্রতিফলনেরও সেই অনুযায়ী রদবদল হচ্ছে। এই আয়না থেকে প্রতিফলিত আলোটা গিয়ে পড়ছে একটা সেলেনিয়াম সেলের ওপর। আলোর মাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে সেলেনিয়াম সেল। এই পরিবর্তনশীল বিদ্যুতকে আবার শব্দশক্তিকে পরিবর্তিত করলেই রেকর্ডের গান শোনা যাচ্ছে। এই রকম যন্ত্র বহুদিন ধরেই চাঁদের আলো, সূর্যকিরণ, কুয়াশা ইত্যাদির হিসেব রাখার কাজে ও কারখানার চিমনী থেকে বেরনো ধোঁয়ার ঘনত্ব মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া অনেক ক্যামেরার সঙ্গে লাগানো "লাইট মিটার" বা "আলো মাপার যন্ত্রে"ও অনেক সময় সেলেনিয়াম সেল ব্যবহার করা হয়। আলোর মাত্রা যত বেশী হয়, সেল থেকে তত বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেইজন্যে মিটারের কাঁটা দেখে আলোর তীব্রতার মাপ নেওয়া যায়।

কিরণদা বললেন, "সেলেনিয়াম ফটোভোলটাইক জাতের সেল। যে সেল আলো থেকে বিদ্যুত উৎপন্ন করে তাকেই আমরা ফটোভোলটাইক সেল বলি। এবার তোমাদের সেলেনিয়াম সেল তৈরি করা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে নিই। প্রথমে ৩ ইঞ্চি লম্বা আর ১ ইঞ্চি চওড়া ছোট্ট একটা অভ্রর টুকরোর ওপর দুটো তামার তার পেঁচিয়ে নেওয়া হয়। তারপর তারের ওপর গলিত সেলেনিয়ামের পাতলা একটা আবরণ লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেলেনিয়াম

ঠাণ্ডা হয়ে জমাট হবার পর আবার একবার গরম করা হয়। তখন সেলেনিয়ামের কালো রঙটা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। এবার আলো পেলেই এটা ব্যাটারির মতো বিদ্যুত দিতে পারে। আরেক ভাবেও সেলেনিয়াম সেল্ তৈরি হয়। টুকরো টুকরো অভ্র আর পেতলের খুব পাতলা পাতলা পাত নেওয়া হয়। তারপর একটা পেতল, একটা অভ্র আবার একটা পেতল—এইভাবে পাতগুলো গায়ে গায়ে লাগিয়ে সাজিয়ে ফেলা হয়। পেতলের পাতটা অভ্রের পাতের চেয়ে একটু বেশী চওড়া হয়। তাই সাজাবার পর দেখা যায় পেতলের পাতগুলো একধারে একটু করে বেরিয়ে আছে। এবার পেতল আর অভ্রের মাঝখানের ফাঁকগুলো গলিত সেলেনিয়াম ঢেলে ভর্তি করে দিলেই সেলেনিয়াম সেল তৈরি। লোহা-সেলেনিয়াম সেলের সেলেনিয়ামের ওপর প্রায়-স্বচ্ছ একটা ধাতুর আবরণও লাগানো হয় অনেক সময়। এই প্রায়-স্বচ্ছ ধাতব আবরণের থেকে বেরিয়ে আসে একটা তার আর লোহার প্লেট থেকে বেরিয়ে আসে দ্বিতীয় তার। প্রায়-স্বচ্ছ ধাতব আবরণের ওপর আলো ফেলে তার দুটোকে যুক্ত করলেই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।”

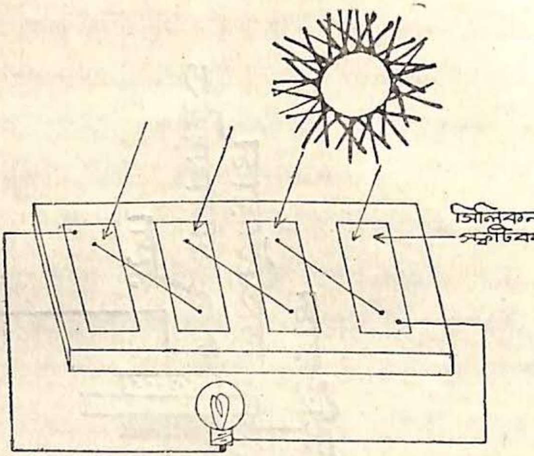
কিরণদা ওদের এবার শো-কেসের পাশের বাক্সটার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ফটোভোলটাইক সেল হলেই সেলেনিয়াম দিয়ে তৈরি হবে এমন কোন কথা নেই। কপার অক্সাইড ও সীসে বা কপার অক্সাইড ও কপার, মানে তামা দিয়েও ফটোভোলটাইক সেল তৈরি হয়েছে। (পরের পাতায় দেখো, একটা ইণ্ডিয়াম ও রূপোর সেল দেখানো হয়েছে।)

কিরণদার কাছ থেকে জানা গেল, পাতলা কাগজের মতো ক্যাডমিয়াম সালফাইডের স্ফটিকের পাতের একপাশে থাকে ইণ্ডিয়াম আর অন্য পাশে রূপোর পাতলা একটা আবরণ। ইণ্ডিয়াম একটা নরম ধাতু, এর পাতলা আবরণটা প্রায় স্বচ্ছ। সূর্যের আলোকে এই ইণ্ডিয়ামের ওপরেই ফেলা হয়। ইণ্ডিয়ামের সঙ্গে



চারটি ইণ্ডিয়াম-রূপো সোলার সেল একসঙ্গে জোড়া হয়েছে

একটা আর রুপোর সঙ্গে আরেকটা তার জুড়ে রাখা হয়। এই তার দুটো থেকেই পাওয়া যায় বিদ্যুৎ।



সিলিকন স্ফটিক সেল

কিরণদা বললেন, "এবার সিলিকন স্ফটিক সেল দেখবে চলো। এটা কিন্তু ফটোভোলটাইক জাতের সেল নয়। একে বলে পি-এন জাতের সেল। পি-এন মানে পজিটিভ ও নেগেটিভ। তোমরা জানতো, ব্যাটারির একটা প্রান্তকে বলে পজিটিভ আর অন্যটাকে নেগেটিভ। পজিটিভ (ধনাত্মক) আর নেগেটিভকে (ঋণাত্মক) যুক্ত করলেই তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ মানেই হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহ। ইলেকট্রনগুলো নেগেটিভ বা ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে পজিটিভ বা ধনাত্মক প্রান্তে চলে আসার চেষ্টা করে। ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে বলে বলছি—ধরো, দুটো পাত্রে জল আছে আর একটা পাইপ দিয়ে পাত্র দুটোকে যুক্ত করা আছে। এখন পাত্র দুটোর মধ্যে জলের উপরিতল যদি একই উচ্চতায় থাকে তাহলে জল এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে প্রবাহিত হবে না। কিন্তু একটা পাত্রকে যদি উঁচুতে তুলে বসানো যায় তাহলে

দেখবে উঁচু পাত্র থেকে জল নেমে আসছে নীচের পাত্রে। এখানে জলটাকে যদি ইলেকট্রন বলে মনে করে নাও তাহলে ওপরের পাত্রটা হচ্ছে ঋণাত্মক দিক আর নীচের পাত্রটা ধনাত্মক দিক। সিলিকন সোলার সেল তৈরি হয় এক ধরনের ফিনফিনে কাগজের মতো পাতলা সিলিকনের স্ফটিক থেকে। এর ওপর আলো পড়লেই ইলেকট্রনগুলো জমা হয় একধারে, আর অন্যধারটায় তৈরি হয় গর্ত বা ফাঁকা জায়গা। ইলেকট্রনগুলো যেধারে জড় হয়, সেটা তার মানে ঋণাত্মক দিক আর ফাঁকা জায়গাগুলো তৈরি হয় ধনাত্মক দিকে। এবার ধনাত্মক আর ঋণাত্মক দিক তার দিয়ে যোগ করলে কি হবে বলতো?”

“বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে।” সুদেষ্ণা বলল।

“ইলেকট্রনগুলো ঋণাত্মক দিক থেকে এসে গর্তগুলো ভর্তি করবে।” সৌতি বলল।

“ঠিক বলেছ। একদিক দিয়ে ইলেকট্রন যেমন গর্ত ভর্তি করবে তেমনি সূর্যের আলো আবার নতুন করে ইলেকট্রন জমা করবে একদিকে আর গর্ত সৃষ্টি করবে অন্যদিকে।”

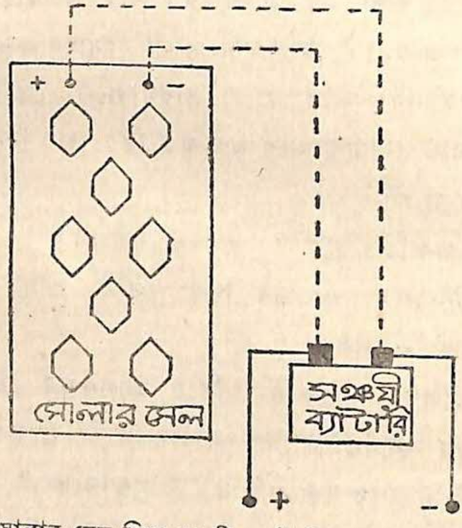
“সিলিকন, সেলেনিয়াম বা ইণ্ডিয়াম—এর মধ্যে কোন সোলার সেলটা সবচেয়ে ভাল? মানে বেশী ব্যবহার হয়?” সৌতি জানতে চাইল।

“এর মধ্যে সিলিকনই এখন সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হচ্ছে। একটা সেলেনিয়াম সেল সিলিকনের চেয়ে বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে কিন্তু সেলেনিয়াম ধাতু হিসেবে মূল্যবান। সিলিকন কিন্তু প্রচুর পাওয়া যায়। সেই সিলিকনকে অবশ্য পরিশোধিত করতে হয় সিলিকন সেল তৈরির জন্য। এখন তো মহাকাশ অভিযানে ভুরি ভুরি সিলিকন সেল ব্যবহার হচ্ছে।”

“কিরণদা, রোদ্দুরের গাড়ি চড়ে আসার সময় আপনি বলছিলেন, দিনের বেলায় একটা ব্যাটারিকে চাঙ্গা করে নেওয়া হয় সোলার

সেল দিয়ে। যাতে রাত্তির বেলায়ও গাড়ি চলতে পারে। সেটা কি ভাবে করে ?" সৌতি জানতে চাইল।

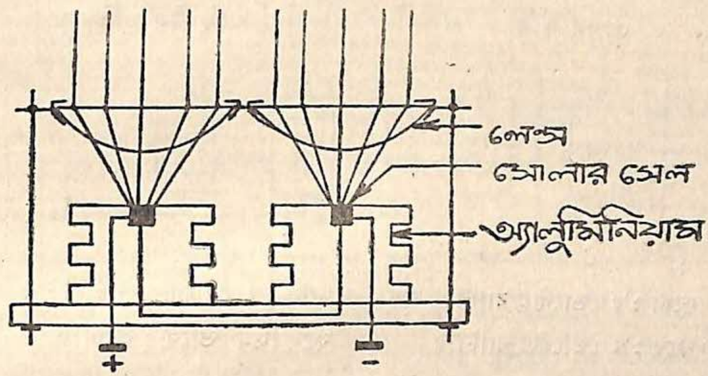
কিরণদা ঘাড় নাড়তে নাড়তেই পকেট থেকে পেন্সিল আর নোটবই বার করে একটা ছবি এঁকে ফেললেন। "ছ্যাখো, বেশ কয়েকটা সোলার সেল দিয়ে একটা বড় ব্যাটারি তৈরি করা হয়েছে।



সোলার সেল দিয়ে সঞ্চয়ী ব্যাটারিকে চার্জ করা বা চাঙ্গা করে নেওয়া

যতক্ষণ রোদ থাকে এই সোলার ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেই বিদ্যুৎ দিয়ে চাঙ্গা করা হয় সঞ্চয়ী ব্যাটারি। সঞ্চয়ী ব্যাটারিতে বৈদ্যুতিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা থাকে। এই সঞ্চয়ী ব্যাটারি থেকে আমরা প্রয়োজন মতো বিদ্যুৎ গ্রহণ করি। সরাসরি সোলার ব্যাটারি থেকে পাওয়া বৈদ্যুতিক শক্তি কাজে লাগালে রাত্তির বেলায় বা মেঘলা দিনে মুস্কিলে পড়তে হবে। সঞ্চয়ী ব্যাটারিটা এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে পরপর বেশ কয়েকদিন সোলার ব্যাটারি বিদ্যুৎ না দিলেও আমরা সঞ্চয়ী ব্যাটারি থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ পেতে পারি।"

কিরণদা আবার একটা ছবি এঁকে ফেললেন নোট বইয়ে। "দেখো, সোলার সেল থেকে বেশী বিদ্যুৎ পাবার জন্যে এই রকম একটা আয়োজন করা হয় আজকাল।"



লেন্সের সাহায্যে সূর্যরশ্মি জড় করে সোলার সেলের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়

ছবিটা দেখেই বোঝা গেল, দুটো লেন্সের সাহায্যে সূর্যরশ্মি জড় করা হচ্ছে দুটো সোলার সেলের ওপর। শুধু সোলার সেল ব্যবহার করে এত বিদ্যুৎ পাওয়া যেত না।

সৌতি জানতে চাইল, "সোলার সেল দুটো ও রকম খাঁজ কাটা-কাটা জিনিসের মধ্যে বসানো হয়েছে কেন?"

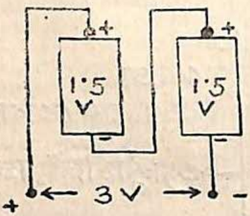
"ওগুলো অ্যালুমিনিয়াম থেকে তৈরি হয়। সোলার সেলটা সূর্যের তাপে বেশী গরম হয়ে গেলে তার বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা কমে আসে। খাঁজ কাটা-কাটা অ্যালুমিনিয়ামের টুকরোটা সোলার সেলের তাপ কমাতে সাহায্য করে।"

কিরণদা এবার আরেকটা ছবি এঁকে মুখ তুলে চাইলেন। "এটা কি এঁকেছি বলতো?"

সুদেষ্ণা বলল, "টর্চের ব্যাটারির মতো লাগছে। দুটো ব্যাটারি দু' রকম ভাবে যোগ করা হয়েছে তার দিয়ে। তাই জন্যে প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে দুটো দেড় ভোল্টের ব্যাটারি এখন একটা তিন

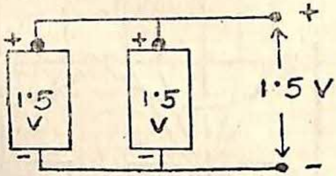
ভোল্টের ব্যাটারির সমান হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ছবিটায় কিন্তু ব্যাটারি দুটো ঠিকভাবে জোড়া হয়নি তাই দুটো দেড় ভোল্টের ব্যাটারি জুড়েও সেই দেড় ভোল্ট পাওয়া যাচ্ছে।”

প্রথম ছবি



দুটো ১·৫ ভোল্টের ব্যাটারী যুক্ত করে ১·৫ ভোল্টের ব্যাটারি

দ্বিতীয় ছবি



দুটো ১·৫ ভোল্টের ব্যাটারি যুক্ত করে তিন ভোল্টের ব্যাটারি

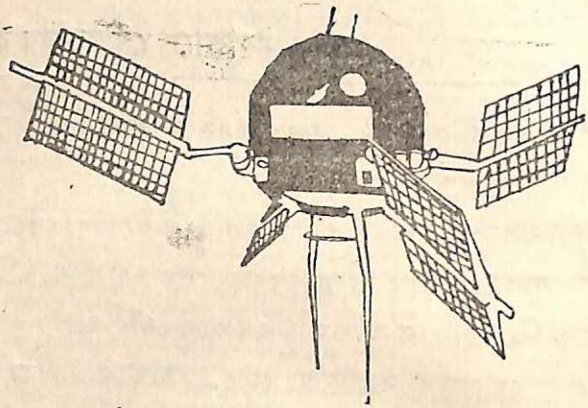
“প্রথম ছবিটার সম্বন্ধে তুমি ঠিকই বলেছ কিন্তু দ্বিতীয়টার সম্বন্ধে নয়। তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয় টর্চ আছে? দু' ব্যাটারির টর্চ হলে সেখানে ব্যাটারি দুটো ঠিক ওই প্রথম ছবিটার মতো করেই যুক্ত থাকে। মানে, ব্যাটারির ক্ষমতা বেড়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটায় ব্যাটারি দুটো যোগ করার পর তাদের ক্ষমতা না বাড়লেও তাদের আয়ু বেড়ে গেছে। মানে, একটা টর্চের ব্যাটারি দুটোকে যদি দ্বিতীয় ছবির মতো করে যোগ করা হত তাহলে তার ক্ষমতা একটা ব্যাটারির সমান হলেও সেটা একটা ব্যাটারির চেয়ে দু'গুণ বেশী সময় ধরে জ্বলতে পারতো। কেন এইসব কথা বলছি জানো? এই পদ্ধতি অনুসারেই অনেকগুলো সোলার সেল জুড়ে সোলার ব্যাটারি তৈরি করা হয়।”

সোলার সেল কম্পানি দেখে তিনজনে আবার গাড়িতে এসে উঠল।

কিরণদা বললেন, "এবার আমরা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে যাব। রাশিরাশি সোলার সেলের ব্যবহার হচ্ছে এখন মহাকাশ অভিযানে। সত্যি বলতে কি মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে সৌর ব্যাটারির গুরুত্ব অপরিসীম। যে-কোন মহাকাশ যানে, মহাকাশ কেন্দ্রে বা গ্রহ উপগ্রহদের পিঠে স্থাপিত কলকারখানা বা যন্ত্রপাতির বিদ্যুতের চাহিদা মেটায় এই সৌর-ব্যাটারি। চাঁদের পিঠে যে মান-মন্দির বসাবার কাজ চলছে তারও সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ ও প্রেরণের কাজে সৌর-ব্যাটারির বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সৌর ব্যাটারি মহাকাশেও খুব নির্ভরযোগ্য। প্রথমে ভয় ছিল অত্যন্ত গরম হয়ে গেলে সৌর-ব্যাটারির সিলিকন ধাতু হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দেখা গেছে সিলিকনের উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছলে তার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্ধেক হয়ে যায় ঠিকই কিন্তু ঠাণ্ডা হলেই আবার আগের ক্ষমতা ফিরে আসে। তাছাড়া ঘুরন্ত কৃত্রিম উপগ্রহের গায়ে লাগানো সৌর-ব্যাটারিগুলো একটানা সূর্যের আলোয় থাকে না। ফলে তাদের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশী ওঠে না।"

কিরণদার হাতে একটা বই ছিল। হঠাৎ বইটার খবরের কাগজের মলাটের ওপর চোখ পড়তেই কিরণদা এক গাল হেসে বললেন, "এই দেখো, পুরনো খবরের কাগজের পাতায় 'এক্সপ্লোরার-৬'-এর ছবি। মহাশূন্যে পৌঁছবার আগে অবধি এরা ঠ্যাঙ ও ডানা গুটিয়ে রাখে। তারপর নিজের কক্ষপথে পৌঁছে ডানা মেলে ধরে

রোদ্দুরে। ওই ডানাগুলোর গায়েই লাগানো আছে সোলার সেল—চার হাজার আটশোটা। আর ওই যে নিচের দিকে লম্বা লম্বা দুটো



লম্বা লম্বা ঠ্যাঙে লাগানো চারটে ডানায় আছে ৪৮০০টা সোলার সেল। ছবিটা 'এক্সপ্লোরার-৬' নামে কৃত্রিম উপগ্রহের

শুঁড়ের মতো দেখছো, ওগুলো হচ্ছে এরিয়াল। পৃথিবীর সঙ্গে ওরই মারফত বেতারে খবরাখবর আদান-প্রদান করে।"

কিরণদা বইটা কোলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, "আরেকটা মজার খবর শুনবে? আচার্য্য জগদীশ বোসের ডায়েরিতে দেখা গেছে তিনি রোদ্দুর থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করার সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। তিনি অবশ্য সোলার সেল জাতীয় যন্ত্রের কথা ভাবেননি। তিনি ভেবেছিলেন অন্য ধরনের যন্ত্রের কথা এবং সত্যি বলতে আরো উন্নত ধরনের যন্ত্রের কথা। গাছের পাতা জাতীয় জৈব পদার্থের সাহায্যে রোদ্দুর থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেছিলেন। জগদীশ বোসের সেই চিন্তা এতদিনে প্রায় সফল হতে চলেছে বলতে পারো। তবে রোদ্দুর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জৈব পদ্ধতিটাকে এখনো নিখুঁত করা যায়নি।

নিশ্চয় যাবে। কোন আবিষ্কার রাতারাতি ঘটে না, বা একদিনেই কোন প্রক্রিয়া, যন্ত্র বা পদ্ধতিকে নিখুঁত করা যায় না। এই সিলিকন সৌর-সেলের কথাই ধরোনা। প্রথমে সিলিকন ব্যবহার করে সৌর-শক্তির দশ থেকে পনের শতাংশ মাত্র বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিবর্তিত করা যেত। পরে সিলিকনের ওপর বিশেষ এক ধরনের আস্তরণ লাগিয়ে তার সৌরশক্তি রূপান্তরের ক্ষমতা অনেক বাড়ানো গেছল। চোখে দেখা আলো ব্যবহার করে ২২ শতাংশ সৌর-শক্তিকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিবর্তন করা সম্ভব। এই পরিবর্তনের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এখন। প্রায় চল্লিশ শতাংশ ছুঁইছুঁই করছে। কারণ, সূর্যের বিকিরণের মধ্যে অদৃশ্য যেসব রশ্মি আছে, যেমন আলট্রা-ভায়োলেট এবং ইনফ্রারেড রশ্মি, সেগুলোকেও এখন বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। বর্তমানে তিন স্তরে ভাগ করা এক রকম সৌর-ব্যাটারি ব্যবহার করা হচ্ছে যার প্রথম স্তরটা শুধু আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি শুষে নেয়, মাঝের স্তরটা শুষে নেয় চোখে-দেখা আলো আর তৃতীয় স্তরটা শুষে নেয় ইন্‌ফ্রারেড রশ্মি। কিছুদিনের মধ্যেই এমন পদার্থ দিয়ে সৌর-ব্যাটারি তৈরি করা যাবে যার একটা স্তরই এই তিন ধরনের রশ্মি শুষে নেবে। তখন দেখা যাবে সৌর-কিরণের একশো ভাগের পঁয়ষট্টি ভাগ শক্তিকেই বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাচ্ছে।"

মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র

সৌর-গাড়িতে চড়ে সুদেষ্ণা আর সৌতি এসে পৌঁছল একটা অদ্ভুত চেহারার বাড়ির কাছে। বাড়িটা বিরাট একটা গোল বলের মতো। মাথা থেকে লম্বা লম্বা চারটে ঠ্যাঙ বেরিয়ে রয়েছে।

"বুঝলে সুদেষ্ণা, এই আমাদের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র।"

"কিন্তু এরকম বিদ্‌কুটে চেহারা কেন বাড়িটার?" সৌতি প্রশ্ন করল।

"এই বাড়িটা স্পুটনিকের চেহারা নকল করে তৈরি করা হয়েছে। স্পুটনিকের নাম নিশ্চয় শুনেছ তোমরা? ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে রুশ দেশের মানুষ স্পুটনিক নামে আকাশে একটা নকল চাঁদ পাঠায়। সেইদিন থেকেই শুরু হয় এক নতুন যুগ— যাকে আমরা মহাকাশ অভিযানের যুগ বলতে পারি। তারপর থেকে একে একে আরো অনেক নকল চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছে, মানুষের দুঃসাহসিক অভিযান থেকে নিত্য নতুন খবর পাওয়া গেছে মহাকাশ সম্বন্ধে। পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশের ওপরেও মানুষের খবরদারি শুরু হয়ে গেছে। শুধু কি কৃত্রিম উপগ্রহ, কৃত্রিম গ্রহ অবধি এখন সূর্যকে পাক খাচ্ছে। মহাকাশ অভিযান শুরু হবার পর থেকেই সৌরশক্তিকে আরো বেশী বেশী করে কাজ লাগানোর জন্যে টনক নড়ে বিজ্ঞানীদের।"

"মহাকাশে প্রথম সোলার সেল কবে ব্যবহার হয়েছিল?" সৌতি জানতে চায়।

"স্পুটনিক-৩ নামে কৃত্রিম উপগ্রহে প্রথম সোলার সেল ব্যবহার করা হয়। এই কৃত্রিম উপগ্রহের সৌর-ব্যাটারিগুলো ন'টি অংশে বিভক্ত ছিল। চারটি বড় অংশ ছিল চার পাশে, চারটি ছোট অংশ সামনে আর একটি পিছনে। স্পুটনিক যেদিকেই ঘুরুক ব্যাটারির কোন না কোন অংশ সূর্যের আলো পেত। এই ব্যাটারিগুলো ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যেত তাই দিয়েই পৃথিবীর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালানো হত। সৌর-ব্যাটারির বদলে রাসায়নিক ব্যাটারি ব্যবহার করলে তার থেকে এতদিন একটানা শক্তি পাওয়া সম্ভব হত না। তাছাড়া রাসায়নিক ব্যাটারি খুব ভারী বলে মহাকাশযানে ব্যবহারের পক্ষে অসুবিধাজনক। আর আয়তনের কথা যদি ধরো তাহলে তো সৌর-ব্যাটারি তুলনাহীন।

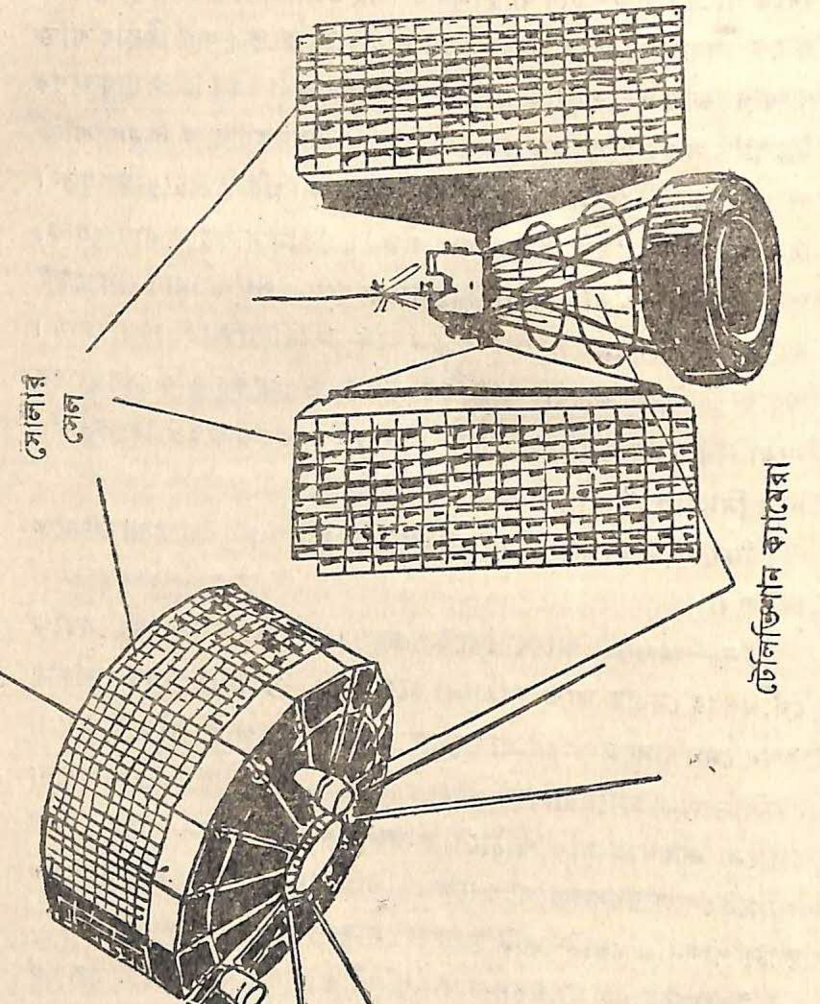
তাছাড়া এরা ঝাড়া পঁচিশ বছর বিদ্যুৎ তো দেবেই। আরো বেশীও দিতে পারে। নকল চাঁদ বা কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর মধ্যে যেসব যন্ত্রপাতি থাকে সেগুলো বেশীর ভাগই চলে বিদ্যুৎ-শক্তিতে। এই বিদ্যুৎ-শক্তি পাবার জন্যেই সোলার সেল ব্যবহার করা হয়। মহাকাশের যন্ত্রপাতি যত হালকা হয় ততই সুবিধে। সেদিক থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি পাবার জন্যে সোলার সেল্ বা সৌর-ব্যাটারি সবচেয়ে উপযুক্ত। তাছাড়া বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য অন্য যে-কোন ব্যবস্থাই রাখা হোক, তার আয়তন সৌর-ব্যাটারির মতো হতে পারে না। কাজেই মহাকাশে নকল উপগ্রহদের কাজেকর্মে সৌর-ব্যাটারি অপরিহার্য। এবার এদিকে ত্যাখো—এই যে তু'টো উপগ্রহের ছবি দেখছ, এর মধ্যে নিচের দিকেরটার নাম টাইরস্ আর ওপরের দিকেরটার নাম নিম্‌বাস।"

"এতে করে কি মানুষ পাঠানো হয়েছিল?" সুদেষ্ণা জানতে চাইল।

"না—এগুলো আবহাওয়া উপগ্রহ। পৃথিবীর আবহাওয়া সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। পৃথিবীর ওপর কোথায় কখন মেঘ জমছে তারই ছবি তুলে পাঠাবার জন্য। ছবিতে ত্যাখো টেলিভিশান ক্যামেরা বলে লেখা রয়েছে। ওই ক্যামেরার সাহায্যে কোনো জায়গায় ছবি পাঠানোর জন্য যে-বিদ্যুৎশক্তি লাগে সেটা আসছে সোলার সেলগুলো থেকে। টাইরসের গায়ে আর নিম্‌বাসের তুটো পাখনায় ছোট ছোট অসংখ্য সোলার সেল বসানো আছে।"

"আচ্ছা, এই টাইরস্-টাই পৃথিবীর প্রথম আবহাওয়া উপগ্রহ না?" সৌতি প্রশ্ন করল।

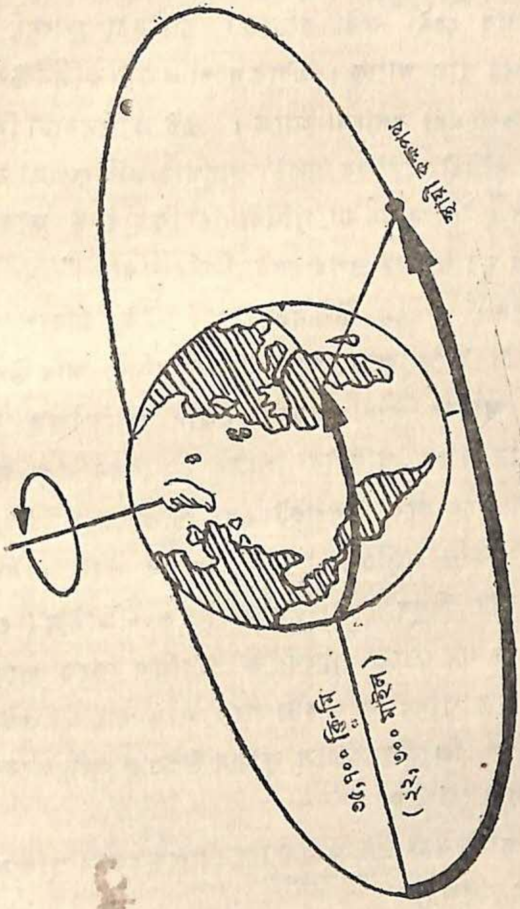
"ঠিক বলেছ। ১৯৬০ সালে এটা পাঠানো হয়। তবে নিম্‌বাস এর চেয়েও উন্নত ধরনের আবহাওয়া উপগ্রহ। সত্যি বলতে আসন্ন ঝড়ঝঞ্ঝার সম্বন্ধে পৃথিবীর মানুষকে আগে থেকে সতর্ক করে দিয়ে এরা যে কত লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে সে আর বলার কথা নয়।"



টাইরস (নিচের ছবিটা)

নিম্বাস (ওপরের ছবিটা)

সৌতি আর সুদেষ্ণা এবার একটা মডেলের সামনে এসে দাঁড়াল। বনবন করে একটা বিরাট বল ঘুরছে আর তাকে প্রদক্ষিণ করছে ছোট্ট একটা বল।



পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিক্রমা করছে কৃত্রিম উপগ্রহ

কিরণদা বলল, "ওই বড় বলটা পৃথিবী, নিজের অক্ষের ওপর পাক্ খাচ্ছে, আর ছোট বলটা একটা কৃত্রিম উপগ্রহ। আচ্ছা, বলতো দেখি, কোনো মজার জিনিস কি তোমাদের চোখে পড়ছে?"

সৌতি তড়বড় করে বলে উঠল, "পৃথিবীর গায়ে একটা লাল ফোঁটা আর কৃত্রিম উপগ্রহের গায়েও আরেকটা লাল ফোঁটা রয়েছে।

এই দু'টো লাল ফোঁটার মধ্যে দূরত্ব দেখছি কখনোই কমছেও না বা বাড়ছে না।"

"সাবাশ্। এই তো ধরে ফেলেছ। ঠিক ওই ব্যাপারটাই এখানে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তোমরা জানো, পৃথিবী তার অক্ষের ওপর পাক খাচ্ছে। এবার ধরো একটা কৃত্রিম উপগ্রহের ওপর একটা ক্যামেরা বসানো আছে। এই ক্যামেরাটা দিয়ে কি যে-কোন সময় পৃথিবীর বিশেষ একটা জায়গার ছবি তোলা যাবে?"

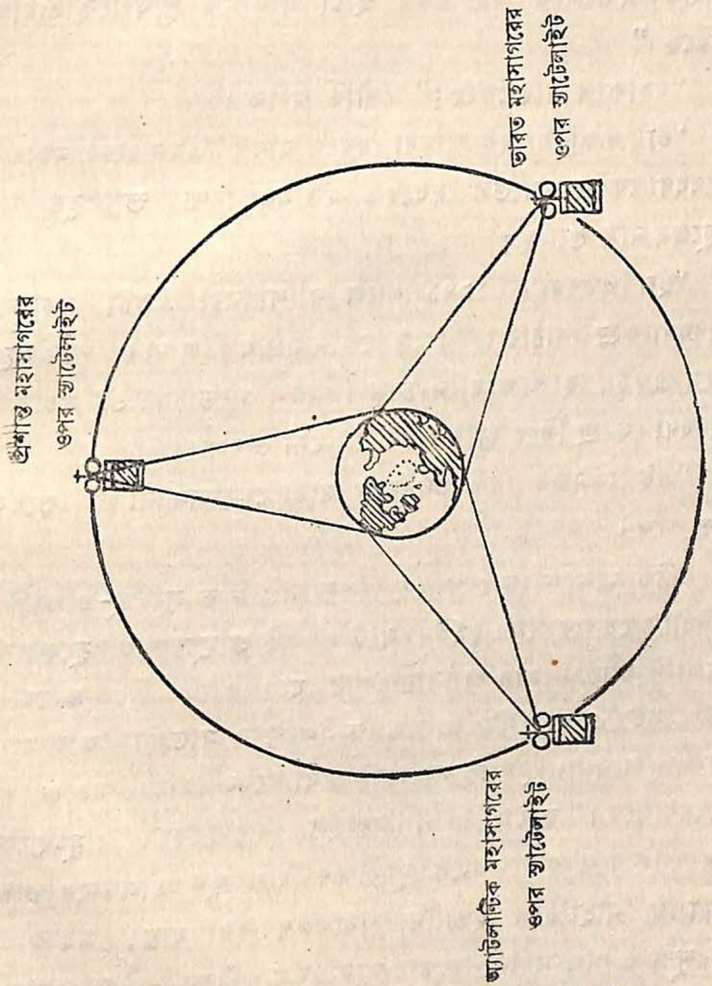
সুদেষ্ণা বলল, "বোধ হয় না, পৃথিবী তো স্থির নেই তাই কৃত্রিম উপগ্রহ কিভাবে ঘুরছে তার ওপর সেটা নির্ভর করবে।"

"ঠিক বলেছ। কৃত্রিম উপগ্রহটা যদি ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীকে একটা করে পাক্ খায় তবেই পৃথিবী আর উপগ্রহের যে-কোন দুটি স্থানের মধ্যে কখনো কোন আপেক্ষিক বিচ্যুতি ঘটবে না। তার মানে, পৃথিবীর পিঠের যে-কোন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে, উপগ্রহটা যেন আকাশে দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে। কোন নড়াচড়া নেই। হিসেব করে দেখা গেছে একটা উপগ্রহ যদি বিষুব রেখা থেকে ২২,৩০০ মাইল (৩৫,৭০০ কিলোমিটার) ওপরে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তবে সেটা ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীকে একটা করে পাক খায়। এই রকম কৃত্রিম উপগ্রহকে জিওসিন্ক্রনাস্ কৃত্রিম উপগ্রহ আর এদের কক্ষ-পথকে 'স্থায়ী কক্ষপথ' বলে।"

"উপগ্রহ স্থায়ী কক্ষপথে ঘুরলে কি বিশেষ কোন সুবিধে হয়?" সুদেষ্ণা জানতে চাইল।

"নিশ্চয়। তোমরা নিশ্চয় সংযোগরক্ষাকারী উপগ্রহের কথা শুনেছ। টেলিফোন, রেডিও আর টেলিভিশান মারফত বিশ্বের প্রত্যেকটি অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে এইরকম স্থায়ী কক্ষপথে বসানো উপগ্রহদের মাধ্যমে। পৃথিবীর পিঠ থেকে পাঠানো সঙ্কেত উপগ্রহ থেকে প্রতিফলিত হয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে

গিয়ে পৌঁছয়। এবার পাশের ছবিটায় ছাখো, স্থায়ী কক্ষপথে তিনটে উপগ্রহ রয়েছে। তিনটের কম উপগ্রহ পাঠিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জায়গার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় বুঝতে পারছ ?”



রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য স্থায়ী কক্ষপথে তিনটি জিওসিন্‌ক্রনাস্ উপগ্রহ

"পৃথিবীটা গোল……" সুদেষ্ণা সবে বলতে শুরু করেছিল কিন্তু সৌতি বাধা দিল, "থাক, থাক—তোকে আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না।"

কিরণদা বললেন, "শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই নয়, মহাকাশ শক্তিকেন্দ্রগুলোও এই রকম স্থায়ী কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।"

"মহাকাশ শক্তিকেন্দ্র?" সৌতি অবাক।

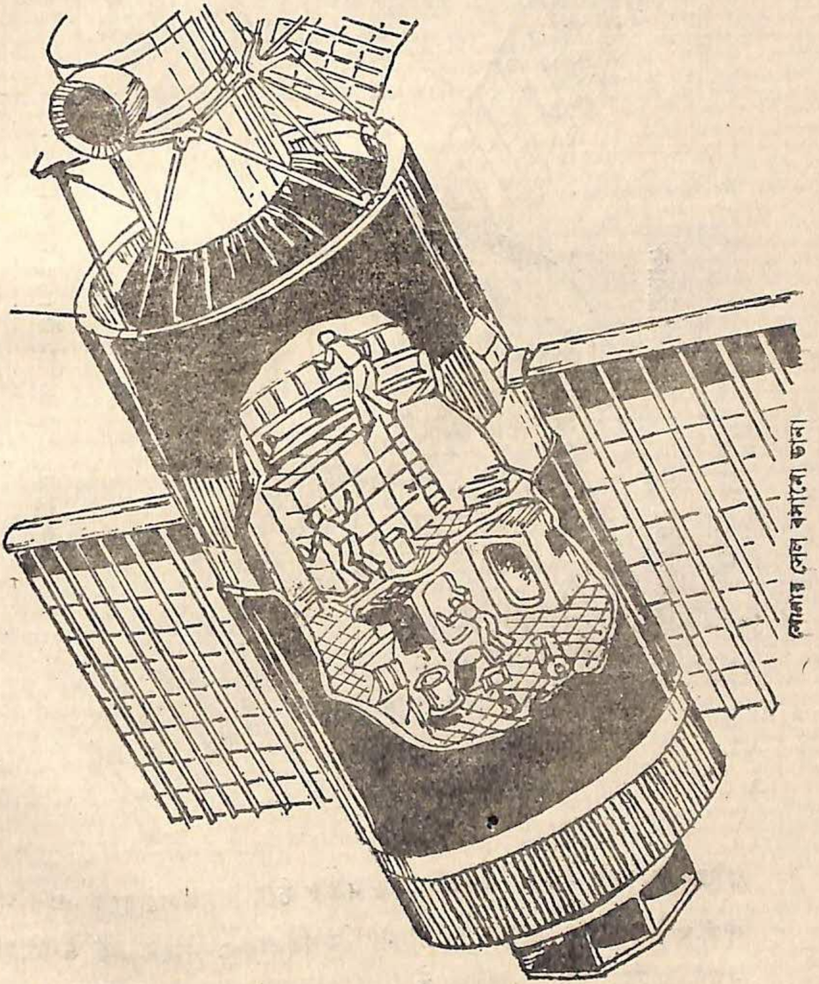
"হ্যাঁ, একটু বাদেই আমরা দেখতে যাব। এখন চলো, মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের মডেল দেখবে। তোমরা নিশ্চয় স্যালিয়ুত্ আর সয়ুজের নাম শুনেছ?"

"হ্যাঁ কিরণদা। ১৯৭১ সালে রাশিয়ানরা একটা মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র পাঠায়। তাতে কোন মানুষ ছিল না। পরে সয়ুজ নামে একটা মহাকাশ যানে চড়ে তিনজন নভোচর ওই মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে গিয়ে হাজির হন।" সৌতি বলল।

"এই তিনজন পরে দুর্ঘটনায় মারা গেছলেন না?" সুদেষ্ণা প্রশ্ন করে।

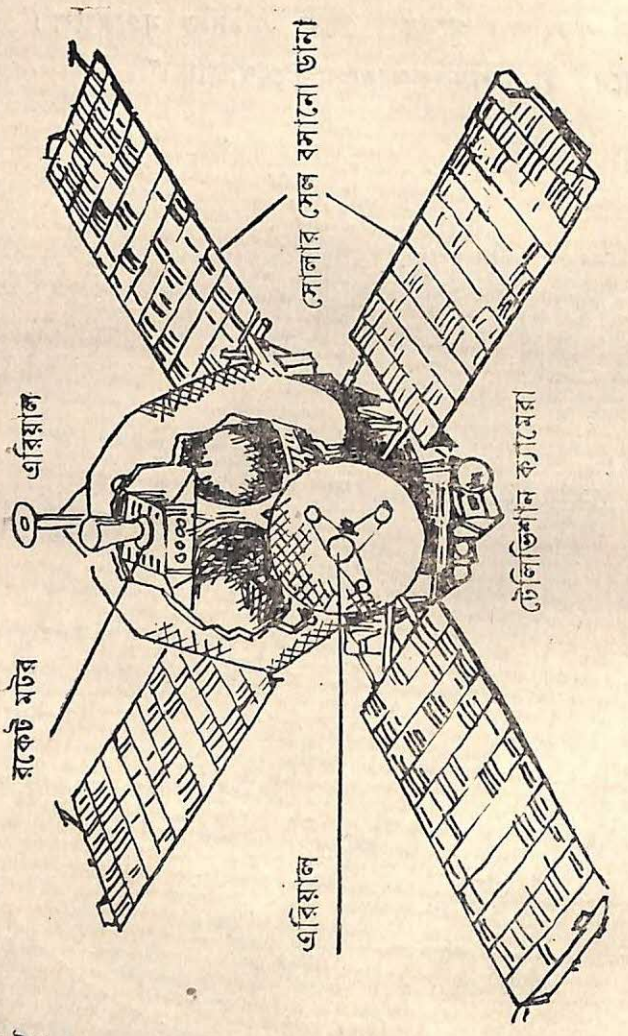
"ঠিক মনে আছে দেখছি। তিন সপ্তাহ স্যালুয়েত্-এ কাটিয়ে পৃথিবীতে ফেরার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। এই স্যালুয়েত ও সয়ুজের সব যন্ত্রপাতি চলতো সৌর ব্যাটারির সাহায্যে। এবার এদিকে ছাখো—এটা সেই এককালের প্রসিদ্ধ স্কাইল্যাবের মডেল। স্কাই মানে আকাশ আর ল্যাব্ হচ্ছে ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগারে। মহাকাশের গবেষণাগার। স্কাইল্যাব পাঠিয়েছিল আমেরিকা। বায়ুমণ্ডলের বাধা নেই বলে এখানে বসে দূরবীক্ষণ দিয়ে খুব ভালভাবে তারা, ছায়াপথ, নীহারিকা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা যায়। মহাকাশে ভারশূণ্য ও বাতাসহীন অবস্থায় নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালবার জন্য তৈরি করা হয়েছিল স্কাইল্যাব। অ্যাপোলো নামে একটা মহাকাশ যানে করে বিজ্ঞানীরা স্কাইল্যাবে যাতায়াত করত। দেখছো

তো বিরাট দুটো ডানা জুড়ে অসংখ্য সোলার সেল বসানো আছে। তবে এসব এখন ছেলেখেলা হয়ে গেছে। আমরা এখন এর চেয়েও অনেক বড় বড় গবেষণা কেন্দ্র পাঠাচ্ছি মহাকাশে। এগুলো তোমাদের জানাশোনার মধ্যে বলে দেখালাম।"



স্কাইল্যাব

এবার ওরা স্কাইল্যাবের পাশে আরেকটা ডানা-ওলা কৃত্রিম উপগ্রহের সামনে এসে দাঁড়াল। কিরণদা জানালেন, এটা পৃথিবীর



মঙ্গলগ্রহের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মেরিনার-৯

কৃত্রিম উপগ্রহ নয়। মঙ্গলগ্রহের নকল চাঁদ। মঙ্গলগ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে। ১৯৭১ সালে পাঠানো মেরিনার-৯ নামে এই উপগ্রহটি মঙ্গলগ্রহের প্রথম কৃত্রিম চাঁদ। মাত্র এগারো মাসের মধ্যে মেরিনারের টেলিভিশান ক্যামেরা এরিয়ালের সাহায্যে প্রায় সাত

হাজার বেতার ফটো পাঠায় পৃথিবীতে। তার থেকেই মঙ্গলগ্রহের বালুকাময় মরুভূমি, গভীর সব গহ্বর আর বহু আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গেছে। জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা কয়েক শো বছর ধরে যা না জানতে পেরেছিলেন মেরিনার কয়েক মাসের মধ্যেই তার চেয়ে অনেক বেশী তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছিল।

"টাইরস্ ইত্যাদি কিছু কিছু কৃত্রিম উপগ্রহের গায়ে সোলার সেল বসানো আছে আবার মেরিনার বা স্কাইল্যাবের সোলার সেলগুলো দেখছি ডানার ওপর বসানো। এর কি কোন কারণ আছে?" সৌতি জানতে চাইল।

"কারণ আছে বইকি! প্রথম দিকের কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর গায়ে সোলার সেল বসানো হত। কারণ তখন অবধি ডানাওলা উপগ্রহ তৈরি করা যায়নি। ডানাওলা উপগ্রহের অনেক সুবিধে। প্রথমতঃ উপগ্রহটা পাঠাবার সময় ডানাগুলো থাকে মোড়া, কাজেই ডানার জন্যে উপগ্রহের আয়তন বাড়ে না। তারপর মহাশূন্যে গিয়ে এরা যখন ডানা বেছায় তখন তাদের বিশাল বিশাল ডানার ওপর অসংখ্য সোলার সেল বিদ্যুৎ দিতে শুরু করে। উপগ্রহের গায়ে এত সোলার সেল লাগানো সম্ভব নয়। তাছাড়া সোলার সেলগুলো যাতে সব সময় সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতে পারে তার জন্য এই ডানাগুলোকে নাড়াচাড়া করার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র থাকে। উপগ্রহের গায়ে সোলার সেল বসালে কিন্তু সবকটা সোলার সেল একসঙ্গে সমান ভাবে সূর্যের আলো পেতে পারে না।"

মহাকাশ সৌরশক্তি কেন্দ্র

মহাকাশ সৌরশক্তি কেন্দ্র দেখাবার নাম করে এ কোথায় নিয়ে এলেন কিরণদা? রাস্তার দু'ধারে যে দিকেই চোখ যায় শুধু ধানের ক্ষেত। বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে সবুজ আর হলুদের সমুদ্রে।

কিরণদা বললেন, "জানলা দিয়ে মুখ বার করে ওপর দিকে দেখো।"

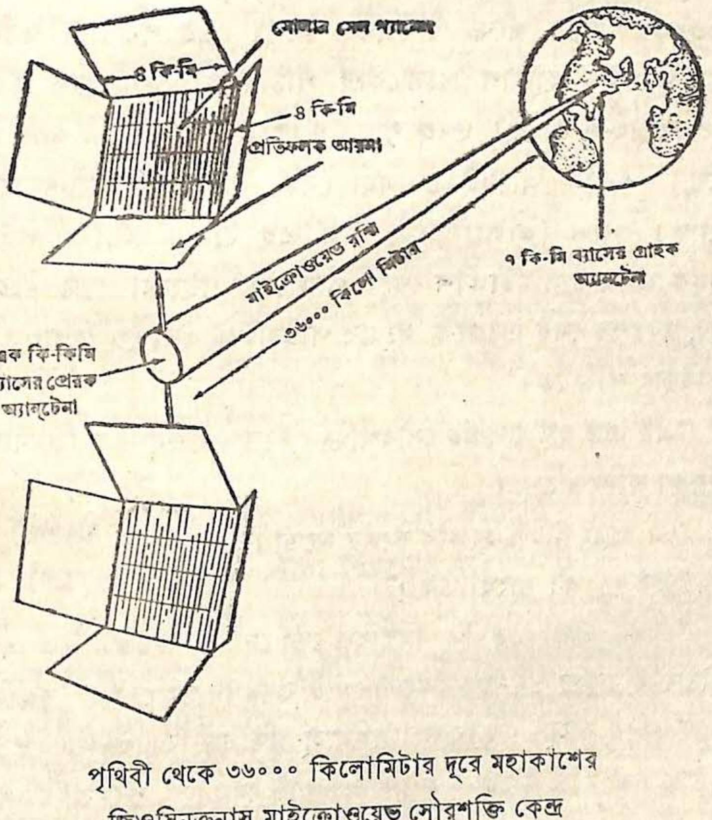
কি আশ্চর্য! ধান ক্ষেতের মাথার বেশ কিছুটা ওপরে একটা তারের জাল বেছানো রয়েছে। বহুদূর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে জালটা।

"এই জালটাই হচ্ছে গ্রাহক অ্যান্টেনা। মহাকাশের জিওসিন্‌ক্রনাস্ উপগ্রহ যে শক্তি পাঠাচ্ছে সেটা এই অ্যান্টেনা গ্রহণ করছে। তারপর আমরা তার থেকে বিদ্যুৎ পাচ্ছি। সামনে একটা লম্বা গম্বুজের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখছো? ওটা হচ্ছে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। বহু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াও ওখানে খুব জোরালো একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে। সারাক্ষণ মহাকাশের সৌরশক্তি কেন্দ্রের ওপর নজর রাখা হয়। আমরাও বরং ওই গম্বুজে চড়ে দূরবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে মহাকাশের সৌরশক্তি কেন্দ্রটাকে একবার দেখে নি', কি বলো?"

পর্যবেক্ষণ গম্বুজে ঢুকে দূরবীক্ষণে চোখ লাগিয়েই বোঝা গেল দু'টো বিরাট বিরাট ডানা রয়েছে উপগ্রহ শক্তি কেন্দ্রটার। ডানার ওপর বসানো আছে অসংখ্য সোলার সেল। প্রত্যেকটা ডানার সঙ্গে আবার চারটে করে আয়না জোড়া যাতে সোলার সেল আরো বেশী সূর্যকিরণ পায়।

কিরণদা বললেন, "দেখলে তো, এবার এদিকে এসো, এই ছবিটা দেখলেই সব বুঝতে পারবে। মহাকাশের শক্তি উপগ্রহটার

দুটো ডানাই চৌকো আকারের। এর এক একটা দিক চার কিলোমিটার করে লম্বা। প্রত্যেকটা ডানায় চারটে করে প্রতিফলক আয়না আছে। এগুলোর ওজন কিন্তু খুব কম। আয়নাগুলো সোলার সেলের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা তিন গুণ বাড়িয়ে



পৃথিবী থেকে ৩৬০০০ কিলোমিটার দূরে মহাকাশের
জিওসিন্‌ক্রনাস মাইক্রোওয়েভ সৌরশক্তি কেন্দ্র

দিয়েছে। এবার লক্ষ্য করো, উপগ্রহটার দুটো ডানার মাঝখানে রয়েছে ১ কিলোমিটার ব্যাসের একটা অ্যান্‌টেনা। এটাকে বলে প্রেরক অ্যান্‌টেনা। সোলার সেল তো সূর্যকিরণ থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করেই খালাস। এই বিদ্যুৎ শক্তিকে পৃথিবীতে পাঠাতে তো হবে! এই অ্যান্‌টেনাটা সেই কাজ করে। উপগ্রহে তৈরি বিদ্যুৎ

পৃথিবীর পিঠে পাঠিয়ে দেয়। তা বলে সরাসরি বিদ্যুৎকে কিন্তু পাঠানো যায় না। তোমরা জানো রেডিও কথা বলে। বহুদূরে রেডিও স্টেশানে বসে একজন গান গায় আর সেই গান অদৃশ্য এক তরঙ্গের রূপে তোমার ঘরের মধ্যে রাখা রেডিওটার এরিয়ালে বা অ্যান্টেনায় এসে পৌঁছয়। তারপর রেডিওর কলকব্জা সেই তরঙ্গকে আবার শব্দে পরিবর্তিত করে। এই শব্দবাহী তরঙ্গের মতোই ওই মহাকাশ শক্তিকেন্দ্র পাঠায় মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ। সেই বিদ্যুৎ-শক্তিবাহী তরঙ্গ পৃথিবীর পিঠে অ্যান্টেনার ওপর এসে পড়ে। একটু আগেই তোমরা সেই গ্রাহক অ্যান্টেনা দেখে এসেছ। সাত কিলোমিটার ব্যাস এই গ্রাহক অ্যান্টেনাটার। গ্রাহক অ্যান্টেনা মহাকাশ থেকে পাঠানো মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গকে ধরে, তারপর সেই তরঙ্গকে আবার পরিবর্তিত করা হয় বিদ্যুৎ তরঙ্গে বা বিদ্যুৎ শক্তিতে।"

"এই এত বড় উপগ্রহ সৌরশক্তি কেন্দ্রের ওজন কত কিরণদা?" সুদেষ্ণা জানতে চায়।

"তা ধরো পঁচিশ হাজার টনের মতো।"

"উফ্! কী সাংঘাতিক!"

"যেমন ওজন তেমনি বিদ্যুৎও তো দেয়! এরকম এক একটা সৌরশক্তি কেন্দ্র ১০ লক্ষ কিলোওয়াট করে বিদ্যুৎ দেয়। বুঝলে?"

"ওরেব্ বাস্। ভাকড়া নাঙগাল্ অত বড় বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র— সেটাও তো মাত্র বারো লক্ষ কিলোওয়াট দেয়।" সুদেষ্ণা বলল।

"কিন্তু এত ভারী উপগ্রহটাকে মহাকাশে পাঠাল কি করে?" সৌতি জানতে চায়।

"একসঙ্গে পুরো উপগ্রহটা পাঠানো হয়নি। টুকরো টুকরো করে বারে বারে পাঠানো হয়েছে। তারপর মহাকাশেই টুকরোগুলো জুড়ে তৈরি করা হয়েছে উপগ্রহটা।"

"আচ্ছা কিরণদা, উপগ্রহটা মহাকাশে পাঠাবার কি দরকার

ছিল? সোলার সেলগুলো পৃথিবীর ওপর বসালেও তো বিদ্যুৎ পাওয়া যেত।" এবার সৌতির জিজ্ঞাসা।

"পাওয়া যেত নিশ্চয় কিন্তু অতটা নয়। মহাকাশে সূর্য কিরণের তেজ অনেক বেশী, তাছাড়া সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা রোদ। তাছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে যার জন্যে হিসেব করে দেখা গেছে যে একটা সোলার সেল পৃথিবীর পিঠে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তার পনের গুণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে মহাকাশে গিয়ে। তাছাড়া আরো একটা সুবিধে আছে। তোমরা জানো তো, আমাদের পৃথিবীতে এখন আর দেশ বলে কিছু নেই?"

"দেশ বলে কিছু নেই মানে? ভারত, পাকিস্তান, চীন…"

"না, ভারত পাকিস্তান, চীন বা রাশিয়া বলে এখন আর কোন আলাদা আলাদা দেশ নেই। সব মিলে জুলে সারাটা পৃথিবী একটা দেশ হয়ে গেছে। এই দেশের কোথায় আছে ভারতীয় সভ্যতা, কোথাও চীনা সভ্যতা ইত্যাদি।"

"এরকম হল কি করে?"

"অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর হয়েছে। ১৯১৮ সালের রুশ বিপ্লব ও ১৯৪৯-এর চীনা বিপ্লবের ধারা অনুযায়ী দু' হাজার খ্রীষ্টাব্দে সারা পৃথিবী জুড়ে এক মহাবিপ্লব ঘটে। তারপর থেকেই দেশে দেশে যুদ্ধ, খুনখারাবি সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর দেশ বলেই কিছু নেই। সারা পৃথিবী একটা দেশ হয়ে একের পর এক শুধুই উন্নতি করে চলেছে। আর সেই জন্যেই এইসব মহাকাশ শক্তিকেন্দ্র কোন একটা দেশের সম্পত্তি নয়। পৃথিবীর সব জায়গায় সব সময় একই রকম বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় না। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শক্তি গ্রহণ কেন্দ্র বিভিন্ন মহাকাশ সৌরশক্তি কেন্দ্র থেকে শক্তি গ্রহণ করে।"

কচুরিপানার চাষবাস

মহাকাশ শক্তিকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়ে কিরণদা ড্রাইভারকে বললেন, "আমরা এবার কচুরিপানা সমবায় ক্ষেত্রে যাব।"

"কচুরিপানা সমবায় ক্ষেত্র? তার মানে?" সৌতির প্রশ্ন কানে না তুলেই ড্রাইভার রোদ্দুরের গাড়ি ছেড়ে দিল।

"কচুরিপানা সমবায় ক্ষেত্রে কচুরিপানার চাষ হয়। জানো তো, কচুরিপানা দারুণ চড়চড় করে বাড়ে। যত কাটবে তত বাড়বে। পুকুরে একবার যদি একটা কচুরিপানা এসে পড়ে আর রক্ষা নেই। ক'দিনের মধ্যে জল আর দেখা যাবে না। সবুজ কচুরিপানা সারা পুকুর ভরিয়ে দেবে।"

আর কত অবাক হওয়া যায়। শেওলা চাষবাসের ব্যাপারটাও হজম করা গেছল, তা বলে কচুরিপানা! "তোমরা কচুরিপানাও খাও নাকি?"

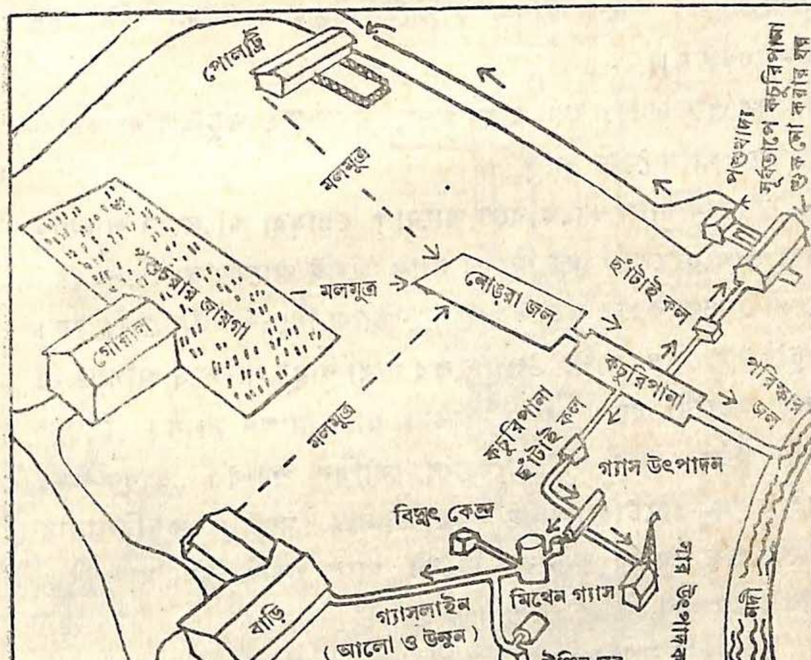
"খুব বেশী নয়। অল্পসল্প। তবে গরু ছাগল মোষ খায়। তাছাড়া কচুরিপানা থেকে খুব ভাল সার পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় গ্যাস। সেই গ্যাস দিয়ে আলো জ্বালানো যায়, রান্না করা যায় এমনকি গ্যাসের ইঞ্জিন চলিয়ে জল তোলা, বিদ্যুৎ উৎপন্ন করাও সম্ভব।"

"এ সবই হচ্ছে কচুরিপানা থেকে?"

"ওই দ্যাখোনা। এসে পড়েছি আমরা।"

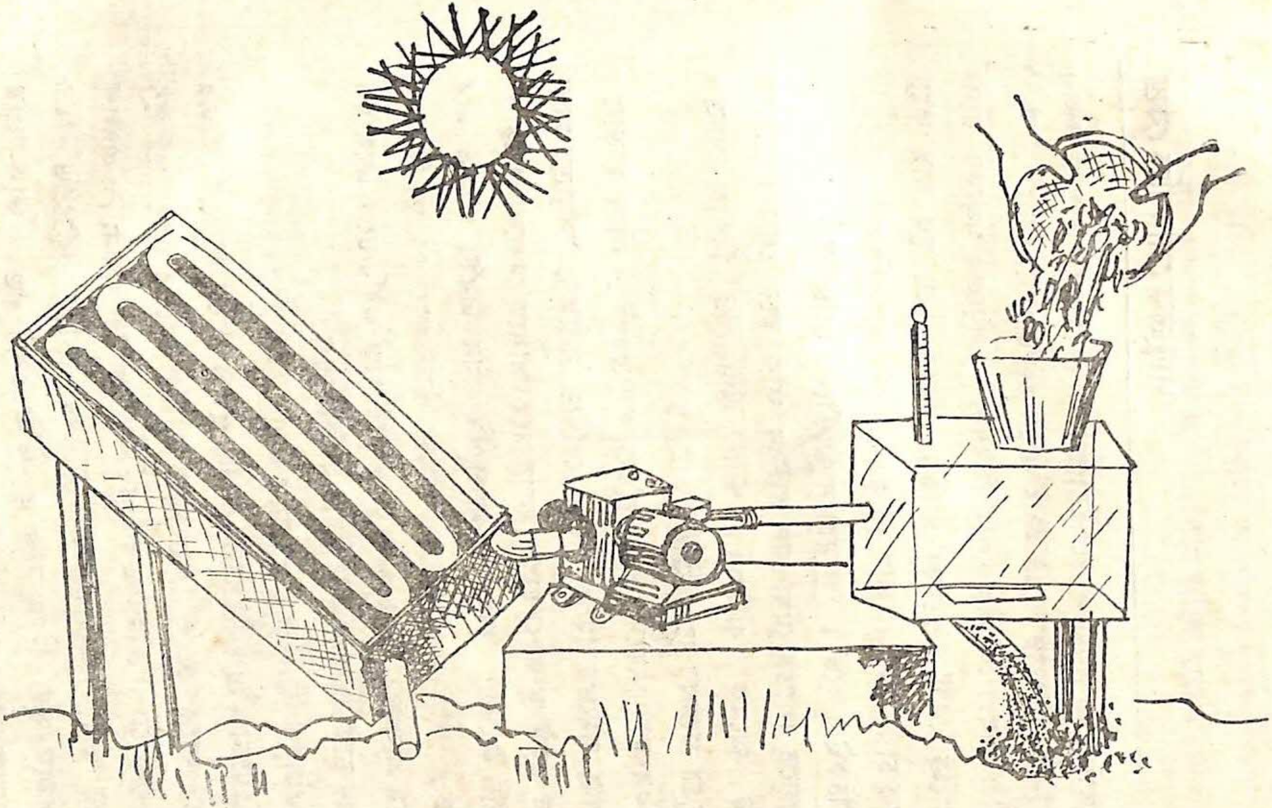
সৌতি ও সুদেষ্ণা একটা উঁচু জমির ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, বিরাট একটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে বেশ খানিকটা অঞ্চল শুধু কচুরিপানা ভরা দুটো বিরাট বিল।

কিরণদা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন কোথায় কি হয়। সামনের বাড়িটায় লোকজন থাকে। বাঁ-দিকেরটা গোয়ালঘর। সবচেয়ে দূরে বাঁ দিকে হাঁস-মুরগীর পোলট্রি। বাড়ি, গোয়ালঘর আর পোলট্রি থেকে পশুপ্রাণীর মলমূত্র এসে পড়ে প্রথম বিলটায়। প্রথম বিলের সঙ্গে দ্বিতীয় বিলটা খাল দিয়ে যুক্ত। দ্বিতীয় বিলটায় চাষ হয় কচুরিপানার। মলমূত্র



কচুরিপানার চাষবাস

কচুরিপানার সার হিসেবে কাজ করে। লে কচুরিপানাও বৃদ্ধি পায় আবার পরিত্যক্ত নোংরাও পরিষ্কার হয়। পরিষ্কার জলটা নদীতে এসে পড়ে। বিল থেকে নিয়মিত কচুরিপানা কাটা হয়। সেই কচুরিপানার খানিকটা রোদের তাপে শুকিয়ে পশুর খাদ্য হয়।



কালো রঙের রোদ্দুর গ্রাহক থেকে গরম হাওয়া টেনে কচুরিপানা শুকনো করা হচ্ছে

বাকি কচুরিপানা ছোট ছোট করে কেটে গ্যাস তৈরির ড্রামে ভরা হয়। এখানে তৈরি হয় মিথেন গ্যাস। মিথেন গ্যাস তৈরি হবার পর যা পড়ে থাকে সেটা খুব উৎকৃষ্ট সার। চাষের কাজে লাগে। মিথেন গ্যাসটা একটা গ্যাস-চেম্বারে আটকে রাখা হয়। তারপর প্রয়োজন মতো কখনো সেই গ্যাসকে রান্নার কাজে উনুনে জ্বালানো হয়, কখনো আলো হিসেবে জ্বালানো হয় আবার কখনো সেই গ্যাস পুড়িয়ে তার তাপে ইঞ্জিন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় জেনারেটারে।

সব শুনেটুনে সুদেষ্ণা প্রশ্ন করল, "কিরণদা, কচুরিপানা থেকে কি করে গ্যাস তৈরি হয় ?"

"মিথেন গ্যাস কাকে বলে জানো ? তোমরা আলেয়ার আলোর কথা শুনেছো তো ? এই মিথেন গ্যাস জ্বলেই আলেয়ার আলো হয়। পাতা-শেওলা ইত্যাদি জলের তলায় পচালে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়। কচুরিপানাকেও গ্যাস উৎপাদকের মধ্যে বায়ুর সংস্পর্শে আসতে না দিয়ে পচানো হয়। তখন পাওয়া যায় মিথেন গ্যাস। মিথেন হচ্ছে কার্বন আর হাইড্রোজেনের যৌগিক পদার্থ। কার্বন আর হাইড্রোজেন দুটোই আছে কচুরিপানার মধ্যে। কচুরিপানার বদলে শুধু গোবর পচিয়েও মিথেন গ্যাস তৈরি করা যায় কিন্তু তার চেয়ে এটা অনেক বেশী কাজ দেয়।"

কিরণদার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কচুরিপানার চাষবাস আর ব্যবহার দেখছিল ওরা। হঠাৎ সৌতি থমকে দাঁড়াল, "কিরণদা, ওখানে একটা কাঁচ লাগানো রোদ্দুর গ্রাহকের কালো বাক্স দেখছি না ?"

"হ্যাঁ। পাইপের মধ্যে হাওয়া গরম হচ্ছে। একটা পাম্পের সাহায্যে সেই গরম হাওয়া দিয়ে কুচিকুচি করে কাটা কচুরিপানা শুকনো করা হচ্ছে একটা পাত্রে।"

সামুদ্রিক সৌরশক্তি কেন্দ্র

রোদ্দুরের গাড়িতে করে সৌতিরা বাঁইবাঁই করে এগিয়ে চলল। বেশ কিছুদূর যাবার পরেই হঠাৎ কানে এল সোঁ সোঁ গর্জন।

"এ আমরা কোথায় এলাম কিরণদা? সমুদ্রের গর্জনের মতো শোনাচ্ছে যে!" সুদেষ্ণা গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখতে চায় ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যায় কিনা।

"ঠিকই ধরেছো। আমরা সমুদ্র তীরেই যাচ্ছি।"

বলতে বলতেই দেখা গেল ঝাউবন ফাঁক হয়ে গেছে। চোখে পড়ছে অনেক বাড়িঘর। আর তারপরেই বিশাল সমুদ্র। রোদ্দুরে রাঙতার মতো ঝিকমিক করছে।

কিরণদার পেছনে পেছনে দু'জনে সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়াল। কিরণদা সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "সমুদ্রের মধ্যে বিরাট একটা ঢাকা-দেওয়া গামলার মতো ভাসছে দেখতে পাচ্ছো?"

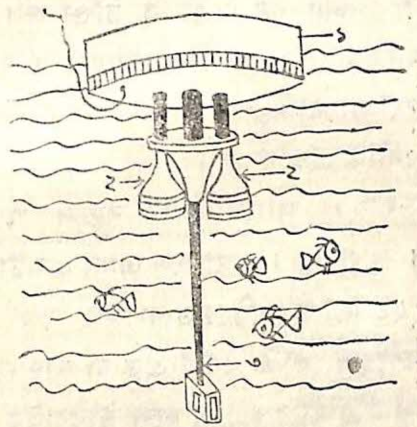
সত্যিই তো। গামলার মতো কি যেন একটা অনেক দূরে ভাসছে। তার মাথা থেকে আবার দুটো তারের মতো কি যেন বেরিয়ে এসেছে। তার দুটো একেবারে পাড় অবধি চলে এসেছে। তারপর ঢুকে গেছে একটা বিরাট বাড়ির মধ্যে।

"এটা কি কিরণদা?" সৌতি প্রশ্ন করল।

"এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। সূর্যের তাপে সমুদ্রের জলের ওপরটা থাকে তেতে কিন্তু নীচের দিকে জলের তাপমাত্রা খুব কম, বেশ ঠাণ্ডা। সমুদ্রের গভীরতা অনেক কিনা। এখানে সমুদ্রের ওপরে জলের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর দু' হাজার ফুট নিচে মাত্র ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাপমাত্রার এই হেরফেরটাকে কাজে লাগিয়ে ওই ভাসমান যন্ত্রে বিদ্যুৎ তৈরি

করা হচ্ছে। চলো—ওই যে বাড়িটা দেখছো, ওখানে এই যন্ত্রটার একটা ছবি আছে। সেটা না-দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। যন্ত্রের বেশীর ভাগ অংশটাই জলের তলায় আছে বলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।”

কিরণদার সঙ্গে ওরা বড় বাড়িটার মধ্যে এসে ঢুকল। কিরণদার কাছে জানতে পারল এটা কন্ট্রোল রুম। এখান থেকেই উৎপন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ওরা একটা ছবির সামনে এসে দাঁড়াল।



সামুদ্রিক তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র
১—টারবাইন ও জেনারেটার যন্ত্র
২—দুটো কণ্ডেন্সার
৩—ঠাণ্ডা জল গ্রহণের পাইপ

কিরণদা বলতে লাগলেন, “ওই যে ১ নম্বর লেখা অংশটা, ওখানে আছে একটা টারবাইন আর একটা জেনারেটার। অ্যামোনিয়া গ্যাসকে সমুদ্রের ওপরের গরম জলের সংস্পর্শে এনে বাষ্প করে সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন যন্ত্রের চাকা ঘোরানো হয়। টারবাইনের চাকা আবার জেনারেটারের চাকা ঘোরায়। জেনারেটার থেকে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ। এবার ২ নম্বর লেখা অংশ দুটো ছাখো। এ দুটোকে বলে কণ্ডেন্সার। টারবাইন যন্ত্রের চাকা ঘোরানোর

পর যে গরম অ্যামোনিয়া বাষ্পটা বেরিয়ে আসে সেটাকে এখানে সমুদ্রের তলার ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে ঠাণ্ডা করে তরল করে দেওয়া হয় তারপর একটা পাম্প সেই তরল অ্যামোনিয়াকে আবার পাঠিয়ে দেয় ১ নম্বর অংশে। তরল অ্যামোনিয়া আবার সমুদ্রের ওপরের গরম জলের তাপে বাষ্প হয়ে যন্ত্রের চাকা ঘোরায়। এবার সরু লম্বা ৩ নম্বর পাইপটা লক্ষ্য করো। এটা একেবারে সমুদ্রের তলা অবধি নেমে গেছে—প্রায় ১৮০০ ফুট লম্বা। এর একেবারে নীচের ফোকর দিয়ে টেনে নেওয়া হয় সমুদ্রের ঠাণ্ডা জল। সেই ঠাণ্ডা জলই কণ্ডেসারে আসে। কি, ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে তো?"

"আচ্ছা কিরণদা, অ্যামোনিয়া ব্যবহার না করে অন্য কিছু ব্যবহার করা যায় না?" সৌতি প্রশ্ন করল।

"নিশ্চয় করা যায়। অ্যামোনিয়ার বদলে অনেক জায়গায় প্রপেন-ও ব্যবহার করা হয়। আসলে এমন একটা তরল ব্যবহার করা দরকার যেটা ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার কম তাপমাত্রাতেই বাষ্প হয়ে যাবে আবার ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার চেয়ে কিছু বেশী তাপমাত্রাতেও তরল হয়ে যাবে। না হলে টারবাইন যন্ত্র চালানো যাবে না।"

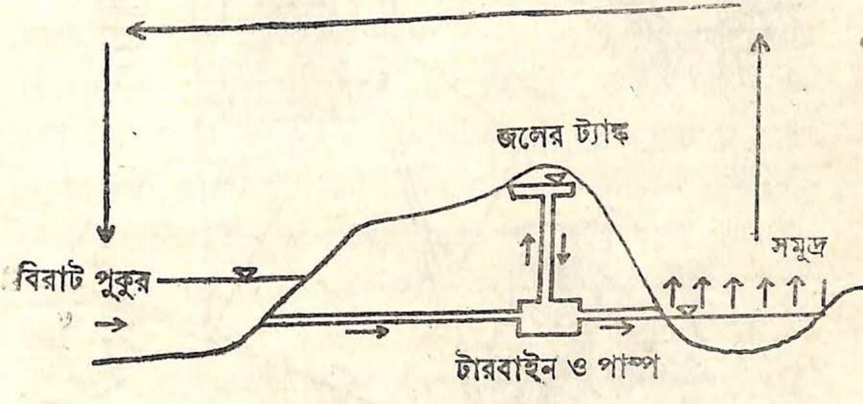
সৌর জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র

সমুদ্রের তীর ছেড়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলেন কিরণদা। ওরা ভেবেছিল গাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। একটু এগোতেই ভুল ভেঙে গেল। খানিক দূরেই চোখে পড়ছে বিরাট এক হ্রদ। মাইলের পর মাইল জুড়ে। প্রথমে তো সমুদ্রেরই একটা অংশ বলে মনে হয়েছিল। হ্রদের একপাশে একটা টিলার মতো রয়েছে। তার মাথায় আবার বিরাট একটা জলাধার।

কিরণদা বললেন, "সমুদ্রের জল আর সূর্যের তাপ এই দুইয়ের

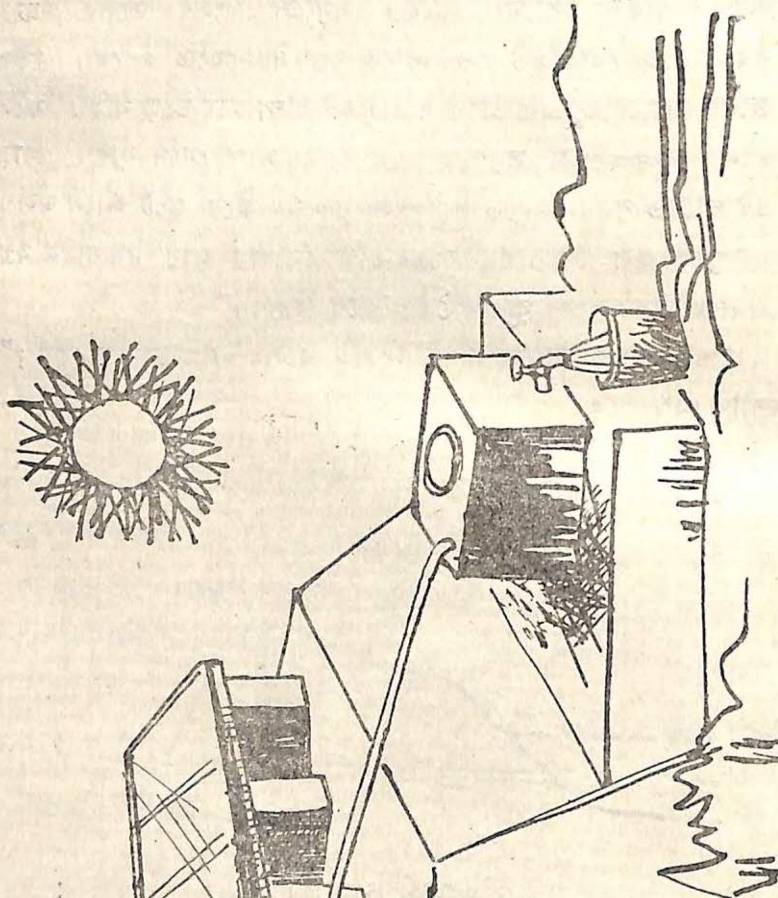
সাহায্যে আরেক রকম পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এখানে। একে বলে হিলিও-জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ওই হ্রদ আর সমুদ্রের মধ্যে একটা পাইপ বসানো আছে। সমুদ্রের জলের তলের উচ্চতা সব সময়েই মোটামুটি একই থাকে বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু হ্রদের জল রোদ্দুরের তাপে সারাক্ষণই বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। ফলে হ্রদের জলের তল সমুদ্রের জলের চেয়ে নীচে নেমে যায়। আর এই ঘাটতি পূরণ করতে পাইপ দিয়ে গর্জন করে ছুটে আসে জল। এই ছুটন্ত জল টারবাইন যন্ত্রের চাকা ঘোরায় আর টারবাইন যন্ত্র জেনারেটারের চাকা ঘুরিয়ে তৈরি করে বিদ্যুৎ।"

"ওই টিলার মাথায় একটা বিরাট জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে কেন?" সৌতি প্রশ্ন করে।



সৌর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
ভুল করে সমুদ্রর জায়গায় লেখা হয়েছে বিরাট পুকুর
আর বিরাট পুকুরের জায়গায় সমুদ্র।

"তোমরা জানো দিনের সবসময় কলকারখানা চলে না। কলকারখানা বন্ধ থাকার সময়টার বিদ্যুতের প্রয়োজন কমে যায়। তখন টারবাইন যন্ত্রটা জেনারেটারের চাকা না ঘুরিয়ে তার বদলে বড় বড় কয়েকটা পাম্প চালায়। টিলার মাথায় জলাধারে সমুদ্রের



সমুদ্রের নোনা জল থেকে খাবার জল তৈরি করা

জল মজুত করে রাখে। তারপর যখন সবচেয়ে বেশী বিদ্যুৎ দরকার হয় তখন ওই জলাধার থেকে জল ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে সমুদ্রের জলের সঙ্গে জলাধারের জল যোগ হওয়ায় টারবাইন থেকে আরো বেশী যন্ত্রশক্তি ও জেনারেটার থেকে সেই অনুপাতে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায়।"

গাড়িতে করে ফেরবার পথে হঠাৎ সুদেষ্ণার চোখে পড়ল রাস্তার একপাশে সারি সারি কতকগুলো দোচালা বাড়ি রয়েছে। বাড়ির চালগুলো কাঁচের। নিশ্চয় রোদ্দুর চোরদের কোন কীর্তি! সুদেষ্ণা বলল, "ওগুলো কি কিরণদা?"

"ওখানে সমুদ্রের জল পাতন (distillation) করা হচ্ছে। ওই কাঁচের বাড়ির মেঝের ওপর জমা আছে সমুদ্রের জল। সূর্য-কিরণ কাঁচের চাল ভেদ করে ওই নোনা জলকে তাতিয়ে তুলছে। তখন সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে ঘরের ভেতর কাঁচের চালের তলায় গিয়ে ঠেকে আবার জলকণার রূপ নিচ্ছে। কাঁচের চালগুলো ঢালু করা বসানো আছে। সেইজন্যে ওই জলকণাগুলো ছাত থেকে নীচে ঝরে পড়ে না। কাঁচ বেয়ে গড়িয়ে আসে দুধারে। সেখানে দুটো পাইপে ক্রমাগত বিশুদ্ধ জল ভর্তি হয়। তারপর পাইপ দিয়ে এই বিশুদ্ধ জল বাইরে এসে খাবার জলের ট্যাঙ্কে জমা হয়।"

"তার মানে এখানে সমুদ্রের নোনা জল থেকে খাবার জল তৈরি হচ্ছে।" সৌতি বলল।

"শুধু তাই নয়। নুনও পাওয়া যাচ্ছে। তোমরা নিশ্চয় জানো নুন গোলা জলকে পাতন প্রক্রিয়ায় শুদ্ধ করে নিলে, নুনটা তলানি হিসেবে পড়ে থাকে।"

পেট্রল ও ডিজেল চাষ

কিরণদার সঙ্গে রাস্তার ধারে এসে দেখা গেল রোদ্দুরের ছোট্ট গাড়িটা নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে অন্য একটা গাড়ি। আকারে একটু বড়ই হবে। চেহারাটাও সাধারণ গাড়ির মতো।

গাড়ির ড্রাইভার ওদের আসতে দেখে দরজা খুলে নেমে এল, "আপনারা আমার গাড়িতে চলুন। রোদ্দুরের গাড়ির ব্যাটারির চার্জটা কমে গেছে বলে গ্যারেজে গেছে। আমাকে আপনাদের নিয়ে যেতে বলেছে।"

"তাই নাকি! বেশ। চলো সুদেষ্ণা—উঠে পড়ি।"

গোঁ-ওঁ-ওঁ শব্দে গাড়ির ইঞ্জিন চালু হতেই সুদেষ্ণা বলল, "একী! এ গাড়িটাতো আমাদের গাড়ির মতো। কিরণদা!"

"ঠিক বলেছ। এটা ডিজেলের গাড়ি।"

"তবে যে আপনি বললেন পেট্রল, ডিজেল সব ফুরিয়ে গেছে!"

"ফুরিয়ে তো গেছেই। এখন আমরা আবার নতুন করে ডিজেল ও পেট্রল তৈরি করছি। কিছু কিছু গাড়িও তাই পেট্রল আর ডিজেল দিয়ে চলছে।"

কিরণদা ড্রাইভারের পিঠে হাত রেখে বললেন, "শোনো, আমাদের একবার ডিজেল ক্ষেতে নিয়ে চলতো?"

"ডিজেল ক্ষেত! তার মানে?"

"চলো না, গেলেই দেখতে পাবে।

কিছুদূর এগোতেই গাড়ির উইণ্ড-স্ক্রিন দিয়ে দেখা গেল সামনেই এক বিশাল বন। প্রায় একশো ফুট ঢেঙা সব গাছ। বনের কাছে যেতেই চোখে পড়ল রাস্তাতে একের পর এক সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অয়েল ট্যাঙ্কার গাড়ি।

সুদেষ্ণা বলল, "এই ধরনের গাড়িতে করে তেল নিয়ে যায় না ?"

"হ্যাঁ। এরা ডিজেল বনে এসেছে তেল নিয়ে যেতে।"

"ডিজেল বন ?"

"হ্যাঁ। এই যে বনটা দেখছ, এখানে শুধু ডিজেল গাছের চাষ হয়। তোমরা জানো নিশ্চয়, এক ধরনের গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে রবার পাওয়া যায়। একই ভাবে ডিজেল গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে দিলে তার থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে ডিজেল বেরোয়।"

"তাল গাছের গুঁড়ি কেটে যেমন হাঁড়িতে রস ভরা হয় ?" সৌতি বলল।

"ঠিক ধরেছ। আসলে পেট্রল বা ডিজেল হচ্ছে এক ধরনের হাইড্রোকার্বন—হাইড্রোজেন ও কার্বনের একটা যৌগিক পদার্থ। এই গাছগুলো সূর্যের আলো ও ক্লোরোফিলের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে এই হাইড্রোকার্বনটি তৈরি করে।"

"কিন্তু ডিজেল গাছ এল কোত্থেকে ?" সুদেষ্ণা জানতে চায়।

ডিজেল গাছ বহুকাল ধরেই পৃথিবীতে আছে। কিন্তু লোকে সে-সম্বন্ধে বড় একটা খোঁজ-খবর রাখত না। ব্রাজিলে আমাজন নদীর তীরে গহন অরণ্যে কোপি ইবা নামে এক ধরনের গাছ হয়। এই কোপি ইবাকেই এখন আমরা ডিজেল গাছ বলি। বিশেষ পদ্ধতিতে সারা পৃথিবী জুড়ে কোপি ইবার বন তৈরি করার চেষ্টা চলেছে।"

"এক একটা গাছ থেকে কতটা করে ডিজেল পাওয়া যায় ?"

"সেটা নির্ভর করে গাছের চেহারার ওপর। একটা ১০০ ফুট লম্বা, তিন-চার ফুট মোটা গুঁড়িওলা গাছে দু' ইঞ্চি মাপের গর্ত করলে ছ'মাস অন্তর প্রায় কুড়ি লিটার করে ডিজেল পাওয়া যায়।"

"ডিজেল গাছের মতো পেট্রল গাছও হয় নিশ্চয় ?" সৌতি খুব উৎসাহ ভরে জিজ্ঞেস করল।

"না, তা হয় না। পেট্রলের বদলে অন্য একটা জ্বালানী অবশ্য

গাছ থেকেই পাওয়া যায়। আর সে গাছটা তোমাদের খুবই চেনা—আখ।”

“আখ থেকে মটরগাড়ির জ্বালানী তেল!”

“হ্যাঁ, আখ থেকে বা গুড় থেকে আমরা ইথাইল অ্যালকহল নামে একটা রাসায়নিক তরল তৈরি করি। ইথাইল অ্যালকহল পুড়িয়ে গাড়ি চালানো যায়। এটা অবশ্য কোন নতুন কথা নয়। উনিশশো চল্লিশ সাল নাগাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পেট্রলের গাড়িতে ১০০ ভাগ পেট্রলের সঙ্গে ৪০ ভাগ ইথাইল অ্যালকহল মেশানো একটা জ্বালানী ব্যবহার করা হত। একে বলা হত গ্যাসোহল। তাছাড়া রেসিঙ কারে মিথাইল অ্যালকহল ও ইথারের মিশ্রণ ব্যবহার করা বহু দিনের রেওয়াজ। অ্যামোনিয়া বা হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করার মতো গাড়ির ইঞ্জিনও তৈরি হয়েছে। এমনকি কাঠকয়লা পুড়িয়ে কয়লা-গ্যাস তৈরি করেও গাড়ি চালানো হয়েছে বিশ্বযুদ্ধের সময়। তবে ইথাইল অ্যালকহল ব্যবহারের বিরাট একটা স্থবিধে আছে। চিনির কলে চিনি তৈরির সময় এতদিন যে তরল পদার্থ বাতিল করে দেওয়া হত তার থেকেই এখন ইথাইল অ্যালকহল তৈরি হচ্ছে। এক সময় হিসেব করে দেখা হয়েছিল ভারতের বাযট্টিটা চিনির কল থেকে চারশো লক্ষ গ্যালন ইথাইল অ্যালকহল পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া কাঠের গুঁড়ো থেকেও ইথাইল অ্যালকহল তৈরি করা যায়। এক টন কাঠের গুঁড়ো দশ থেকে পনের লিটার ইথাইল অ্যালকহল দিতে পারে।”

ডিজেল গাছের রহস্য ভেদ করার পর ওরা আবার গাড়ি চড়ে বসল। ক্লোরোফিল শক্তিকেন্দ্র দেখতে চলেছে। ২৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রোদ্দুর চোরের দেশের মানুষ কৃত্রিম উপায়ে ক্লোরোফিল অবধি তৈরি করে ফেলেছে। কিরণদা বললেন, "ফ্রেডারিক জোলিও কুরির কথা আগেই বলেছি তোমাদের। কৃত্রিম ক্লোরোফিল থেকে শক্তি উৎপাদনের চিন্তাও তাঁর মাথাতেই এসেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আমার ধারণা শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সত্যিকার বিপ্লব তখনই ঘটবে, যখন মানুষ বিভিন্ন অণুর সংযোগ ঘটিয়ে ক্লোরোফিল বা ক্লোরোফিলের চেয়েও কার্যকর কোন কৃত্রিম পদার্থ তৈরি করতে পারবে।' জোলিও-কুরির ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছে। ওই সামনে ছাখো—"

অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা একতলা বাড়ি। তার ছাত ফুঁড়ে ঠিক মাঝখান দিয়ে আকাশে উঠে গেছে লম্বা একটা মিনার। মিনার বা মনুমেণ্টের গা ঘিরে পাক খেতে খেতে নিচে নেমে এসেছে ঘোরানো সিঁড়ির মতো একটা রাস্তা। রাস্তাটার মাথায় ও চারপাশে কাঁচের ঢাকনা লাগানো। ঘোরানো রাস্তাটা মিনারের মাথার কাছে একটা গোলাকার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। আর নিচের দিকে এই রাস্তাটা সেঁধিয়ে গেছে একতলা বাড়িটার অন্দরে।

কিরণদা বললেন, "মিনারটার চুড়োর ওপর একটা গোল ঘর রয়েছে, দেখেছ? ওটা রাসায়নিক কারখানা। ওখানেই ক্লোরোফিল তৈরি হচ্ছে। তারপর ওই ক্লোরোফিল কাঁচ ঢাকা রাস্তা দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে নিচে নামার পথে সূর্যকিরণ গ্রহণ করছে।"

সুদেষ্ণা জানতে চাইল, "ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে কেন ক্লোরোফিলকে? সোজা পথে নামালে কি হত?"

"এইভাবে না নামালে ক্লোরোফিল সূর্যকিরণ থেকে শক্তি গ্রহণ

করার সময় পেত না। কত ধীরে ধীরে নামছে ত্যাখো কালো কালো ক্লোরোফিল।"

"কিন্তু ক্লোরোফিল তো সবুজ হয় জানতাম।" সৌতি বলল।

"গাছের পাতার ক্লোরোফিল সবুজ হয় কিন্তু মানুষের গড়া ক্লোরোফিল কালো। সবুজ ক্লোরোফিল সাদা আলোর মধ্যে লাল ও নীল বর্ণ রশ্মিগুলোকেই প্রধানতঃ গ্রহণ করে। আমাদের তৈরি কালো ক্লোরোফিল কিন্তু সাদা আলোর সবকটা রঙকেই গ্রহণ করে। সেইজন্যে মানুষের গড়া ক্লোরোফিল প্রকৃতির ক্লোরোফিলের চেয়েও বেশী কার্যকর। এবার লক্ষ্য করো ক্লোরোফিলের ধারা যত নেমে আসছে ততই তার চেহারাটা কেমন মোটাসোটা হয়ে উঠছে। কেন জানো, সূর্যের আলো পেয়ে ওর পুষ্টি হচ্ছে। ক্লোরোফিলের ধারা শেষ পর্যন্ত ওই একতলা বাড়িটার মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। ওটাই হচ্ছে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। ওখানে বিরাট বিরাট চুল্লীতে ক্লোরোফিল পোড়ানো হয়। সূর্যের শক্তি ক্লোরোফিলের মধ্যে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে সঞ্চিত হয়েছিল। চুল্লীতে রাসায়নিক শক্তি থেকে পাওয়া যায় তাপশক্তি। আর তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পদ্ধতি তো তোমরা জানোই।"

"কিরণদা, ক্লোরোফিলের তো শুধু আলো হলেই চলে না, কার্বন ডাই-অক্সাইডও লাগে না?"

"লাগেই তো। চুল্লীর মধ্যে ক্লোরোফিল পোড়াবার সময়েই কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। ওই কার্বন ডাই-অক্সাইডকেই কাঁচের ঢাকা লাগানো ক্লোরোফিলের চলন পথের তলার দিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ওপর থেকে নামে ক্লোরোফিল আর নিচ থেকে ওঠে কার্বন ডাই-অক্সাইড।"

"রোদ্দুর চোরের দেশের যত কাণ্ড-কারখানা দেখলাম তার মধ্যে এটাই বোধহয় সবচেয়ে মজাদার। তাই নারে সুদেষ্ণা?"

"কিরে পড়াশোনা করবি না? কখন তো আলো এসে গেছে! পড়ে পড়ে সন্ধ্যেবেলায় ঘুম!"

দাদার হাঁকডাক ঝাঁকানিতে সুদেষ্ণা ধড়মড় করে উঠে বসল।

"জানিস দাদা, কি দারুণ একটা স্বপ্ন দেখেছি। ২৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের একটা দেশে বেড়িয়ে এলাম। রোদ্দুর চোরের দেশ। কলকারখানা আলো পাখা সব চলছে রোদ্দুরের তেজে। অথচ ওদের কয়লা তেল সব ফুরিয়ে গেছে। বিশ্বাস করা যায় না।"

"নে নে বক্তৃতা দিসনি। বাবার কাছে গল্প শুনে এখন গুল্ মারছিস। আমি বুঝি দেখিনি, বাবা সেদিন লাইব্রেরি থেকে একগাদা বই এনেছে। সবই তো সূর্য থেকে কিভাবে শক্তি পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে।"

"কিন্তু তার বেশীর ভাগই তো ভবিষ্যতে কি হতে পারে বা হবে..."

"সেই সবই তোর মাথায় গিজগিজ করছিল তাই ওরকম স্বপ্ন দেখেছিস।"

"তার মানে আমি যা-যা দেখেছি সবই সম্ভব বল্? আজ হয়নি কিন্তু একদিন নিশ্চয় হবে।"

"আমি তো আর বিজ্ঞানী নই যে বলে দিতে পারবো, হবে কি হবে না।"

বাবা যে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউই খেয়াল করেনি। সুদেষ্ণার পিঠে হাত রেখে বাবা বললেন, "কি সম্ভব আর কি অসম্ভব সেটা ভবিষ্যতে জানা যাবে ঠিকই কিন্তু জানতো, বিজ্ঞানী মাত্রেই স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন না দেখলে তাকে সত্যি করে তোলবার চেষ্টাটাও যে করা যায় না।"

সুদেষ্ণা তাকিয়ে দেখল বাবার মুখের সঙ্গে কিরণদার মুখের কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে।

সুদেষ্ণা যে-সব বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে স্বপ্নে রোদ্দুর চোরের দেশে বেড়াতে গেছল

সান্ পাওয়ার—জে সি ম্যাক্‌ভে
সোলার এনার্জি—হান্‌স্ রাউ
সোলার এনার্জি—ফ্রাঙ্কলিন এম্ ব্র্যান্‌লি
দা কামিঙ এজ্ অফ সোলার এনার্জি—ডি এস্ হ্যালাসি
স্যাটালাইট্‌স্ ইন্ স্পেস ট্র্যাভেল—ব্রবিন কেরোড্
হারনেসিঙ দা সান্—বরিসভ ও পিয়াৎনোভা
এনার্জি রিসোর্সেস্ অ্যাণ্ড এন্‌ভায়ারন্‌মেণ্ট—জেলাইহান ও ফ্লেচার
সোলার হাইড্রোজেন অল্টারনেটিভ্—বক্‌রিস

এ ছাড়াও সায়েন্স টু-ডে, পপুলার মেকানিক্‌স, ইউনেস্‌কো ক্যুরিয়ার, সায়ান্টিফিক আমেরিকান প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

শক্তি কাজ তাপ ও ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক

১ অশ্ব ক্ষমতা = ৭৪৬ ওয়াট = ৩৩,০০০ ফুট-পাউণ্ড/মিনিট = ২১২° ফারেনহাইট উষ্ণতায় ২·৬৪ পাউণ্ড জলের প্রতি ঘণ্টায় বাষ্পীভবন = ১৭৮·২ ক্যালোরি/সেকেণ্ড = ৭৪৮·৪৪ জুল্স/সেকেণ্ড

১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা = ১০০০ ওয়াট-ঘণ্টা = ১·৩৪ অশ্ব ক্ষমতা-ঘণ্টা = ২,৬৫৫,২০০ ফুট-পাউণ্ড = ৩,৬০০,০০০ জুল্স = ৮৬০১০০ ক্যালোরি = ৩৬,০০০,০০০,০০০,০০০ আর্গ = ২১২° ফারেনহাইটে ৩·৫৪ পাউণ্ড জল বাষ্পীভবন = ২২·৮ পাউণ্ড জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি ৬২° ফারেনহাইট থেকে ২১২° ফারেনহাইটে

প্রয়োজনীয় কয়েকটি এককের পারস্পরিক সম্পর্ক

১ মেট্রিক টন = ১০০০ কে. জি. = ২২০৪·৬ পাউণ্ড

১ ফুট = ·৩০৪৮ মিটার

১ কি. মি. = ৩২৮১ ফিট = ·৬২১৪ মাইল

১ ইম্পিরিয়াল গ্যালন = ৪·৫৫ লিটার

...ডিগ্রি ফারেনহাইট = (১·৮ × ...ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) + ৩২

$$\text{...ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড} = \frac{(\text{...ডিগ্রি ফারেনহাইট} - ৩২)}{১·৮}$$

সূর্যের খবরাখবর

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব —	৯২,৯১৩,০০০ মাইল
জানুয়ারী ও জুনের মধ্যে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের পরিবর্তন—	৩০৬৯০০০ মাইল
সৌরজগতের ব্যাস (প্লুটোর কক্ষ)—	৭৪৪০,০০০,০০০ মাইল
সূর্যের ব্যাস—	৮৬৪,০০০ মাইল
সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায়—	১০৩.৯ গুণ বেশী
সূর্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের তুলনায়—	১৩০০০০০ গুণ বেশী
সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায়—	৩৩২,৪৮৮ গুণ বেশী
সূর্যের গড় ঘনত্ব জলের ঘনত্বের তুলনায়—	১.৪১ গুণ বেশী
সূর্যের ওজন সৌরজগতের ওজনের—	৯৭.৭ শতাংশ
সৌর ধ্রুবক (অর্থাৎ প্রতিমিনিটে প্রতি বর্গ সে. মি. জায়গা থেকে সূর্যের বিকিরণের গড়)—	১.৯৪ ক্যালোরি বা, .৩৫৪ ওয়াট বা, .৩৬ আর্গ
সূর্যে সঞ্চিত শক্তি—	৪২৬৬×১০^{৪৬} ক্যালোরি
প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যের শক্তি বিকিরণ—	৯.২৩×১০^{২৫} ক্যালোরি
প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সূর্যের শক্তি—	৯.০৩×১০^{১৬} ক্যালোরি
সূর্যের বয়স—	(তেজস্ক্রিয় গণনা অনুসারে) পাঁচ বিলিয়ন বর্ষ (হয়েলের মতে) পনের বিলিয়ন বর্ষের বেশী